১৯৭১
হুমায়ূন আহমেদ

১৯৭১

১

মীর আলি চোখে দেখে না।

আগে আবছা-আবছা দেখত। দুপুরের রোদের দিকে তাকালে হলুদ কিছু ভাসত চোখে। গত দু' বছর ধরে তাও ভাসছে না। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। তাঁর বয়স প্রায় সত্তুর। এই বয়সে চোখ-কান নষ্ট হতে শুরু করে। পৃথিবী শব্দ ও বর্ণহীন হতে থাকে। কিন্তু তার কান এখনো ভালো। বেশ ভালো। ছোট নাতনীটি যত বার কেঁদে ওঠে তত বারই সে বিরক্ত মুখে বলে, 'চুপ, শব্দ করিস না।' মীর আলি আজকাল শব্দ সহ্য করতে পারে না। মাথার মাঝখানে কোথায় যেন ঝনঝন করে। চোখে দেখতে পেলেও বোধহয় এরকম হত-আলো সহ্য হত না। বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। সবচেয়ে বড়ো যন্ত্রণা—রাত-দুপুরে বাইরে যেতে হয়। একা-একা যাওয়ার উপায় নেই। তাকে তলপেটের প্রবল চাপ নিয়ে মিহি সুরে ডাকতে হয়, 'বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।'

বদিউজ্জামান তার বড় ছেলে। মধুবন বাজারে তার একটা মনিহারী দোকান আছে। রোজ সন্ধ্যায় দোকান বন্ধ করে সাত মাইল হেঁটে সে বাড়ি আসে। পরিশ্রমের ফলে তার ঘুম হয় গাঢ়। সে সাড়া দেয় না। মীর আলি ডেকেই চলে—'বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।' জবাব দেয় তার ছেলের বৌ অনুফা। অনুফার গলার স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। সেই তীক্ষ্ণ স্বর কানে এলেই মীর আলির মাথা ধরে, তবু সে মিষ্টি সুরে বলে, 'ও বৌ, এট্টু বাইরে যাওন দরকার। বদিরে উঠাও।'

অনুফা তার স্বামীকে জাগায় না। নিজেই কুপি হাতে এগিয়ে এসে শ্বশুরের হাত ধরে। বড় লজ্জা লাগে মীর আলির। কিন্তু উপায় কী? বুড়ো হওয়ার অনেক যন্ত্রণা। অনেক কষ্ট। মীর আলি নরম স্বরে বলে, 'চাঁদনি রাইত নাকি, ও বৌ।'

'জ্বি-না।'

'চউখে ফসর-ফসর লাগে। মনে হয় চাঁদনি।'

'না, চাঁদনি না। এইখানে বসেন। এই নেন বদনা।'

অনুফা দূরে সরে যায়। মীর আলি ভারমুক্ত হয়। অন্য রকম একটি আনন্দ হয় তার। ইচ্ছা করে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকতে। অনুফা ডাকে, 'আব্বাজান, হইছে?'

'হুঁ।'

'উঠেন। বইসা আছেন কেন?'

'ফজর ওয়াক্তের দেরি কত?'

'দেরি আছে। আব্বাজান উঠেন।'

মীর আলি অনুফার সাহায্য ছাড়াই উঠোনে ফিরে আসে। দক্ষিণ দিক থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হয়েছে বোধহয়। একটা-দু'টা করে শিয়াল ডাকতে শুরু করেছে। মীর আলি হৃষ্ট গলায় বলে, 'রাইত বেশি বাকি নাই।'

অনুফা জবাব দেয় না, হাই তোলে।

'একটা জলচৌকি দেও, উঠানে বইয়া থাকি।'

'দুপুর-রাইতে উঠানে বইবেন কি? যান, ঘুমাইতে যান।'

মীর আলি বাধ্য ছেলের মতো বিছানায় শুয়ে পড়ে। এক বার ঘুম ভাঙলে বাকি রাতটা তার জেগে কাটাতে হয়। সে বিছানায় বসে ঘরের স্পষ্ট অস্পষ্ট সব শব্দ অত্যন্ত মন দিয়ে শোনে।

বদি খুকখুক করে কাশছে। টিনের চালে ঝটপট শব্দ। কিসের শব্দ? বানর? চৌকির নিচে সবগুলি হাঁস একসঙ্গে প্যাঁকপ্যাঁক করল। বাড়ির পাশে শেয়াল হাঁটাহাঁটি করছে বোধহয়। পরীবানু কেঁদে উঠল। দুধ খেতে চায়। অনুফা দুধ দেবে না। চাপা গলায় মেয়েকে শাসাচ্ছে। বদি আবার কাশছে। ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি? পরশু দিন ভিজে বাড়ি ফিরেছে। জ্বর তো হবেই। বদির কথা শোনা যাচ্ছে। ফিসফিস করে কী-যেন বলছে। কী বলছে? এত ফিসফিসানি কেন? মীর আলি কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে। কাক ডাকল। সকাল হচ্ছে নাকি? মীর আলি ভোরের প্রতীক্ষা করে—তার তলপেট আবার ভারি হয়ে ওঠে।

'বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।'

'কি?'

'এট্টু বাইরে যাওন দরকার।'

বদি সাড়াশব্দ করে না। পরীবানু তারস্বরে কাঁদে। দুধ খেতে চায়।

'ও বদি, বদিউজ্জামান।'

'আসি, আসি।'

'তাড়াতাড়ি কর্।'

'আরে দুত্তোরি! এক রাইতে কয় বার বাইরে যাইবেন?'

বদি প্রচণ্ড একটা চড় বসায় পরীবানুর গালে। বিরক্ত গলায় বলে, 'টর্চটা দাও অনুফা।'

অনুফা টর্চ খুঁজে পায়, কিন্তু অন্ধকারে ব্যাটারি খুঁজে পায় না।

মীর আলি অপেক্ষা করতে-করতে এক সময় অবাক হয়ে বুঝতে পারে তার প্রস্রাব হয়ে গেছে। বিছানার একটা অংশ ভেজা। সে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে। এ-রকম তার আগে কখনো হয় নি।

'আসেন যাই। যত ঝামেলা! দেখি, হাতটা বাড়ান।'

বদি তার হাত ধরে। মীর আলি খুব দুর্বল ও অসহায় বোধ করে।

'এখন থাইক্যা ঘরের মইধ্যে একটা পাতিলে পেশাব করবেন। ঝামেলা ভালো লাগে না।'

'আইচ্ছা।'

'আর পানি কম খাইবেন। বুঝলেন?'

'আইচ্ছা।'

বদি তাকে উঠোনের এক মাথায় বসিয়ে দেয়। মীর আলি প্রস্রাব করার চেষ্টা করে। প্রস্রাব হয় না—ভোঁতা একটা যন্ত্রণা হয়।

বদি হাঁক দেয়, 'কী হইছে? রাইত শেষ করবেন নাকি?'

আর ঠিক তখন মীর আলির সামনে দিয়ে সরসর শব্দ করে একটা কিছু চলে যায়। কী এটা, সাপ? মীর আলির দেখতে ইচ্ছা করে।

'আরে বিষয় কি, ঘুমাইয়া পড়ছেন নাকি?'

'নাহ্! একটা সাপ গেল সামনে দিয়া।'

'আরে দুত্তোরি সাপ—উঠেন দেখি।'

'মনে হয় জাতি সাপ। বিরাট লম্বা মনে হইল।'

'আরে ধ্যুৎ, উইঠা আসেন।'

মীর আলি উঠে দাঁড়ায়। আর ঠিক তখন আজান হয়। মীর আলি হাসিমুখে বলে,'আজান দিছে। ও বদি, আজান দিছে।'

'দিছে দেউখ। ঘরে চলেন।'

'ওখন আর ঘরে গিয়া কী কাম? গোসলের পানি দে। গোসল সাইরা নামাজটা পড়ি।'

বদি বিরক্ত গলায় বলে, 'অজু কইরা নামাজ পড়েন। গোসল ক্যান?'

'শইলডা পাক না। নাপাক শইল।'

'আপনে থাকেন বইয়া, অনুফারে পাঠাই। যত ঝামেলা।'

বদিউজ্জামান তার বাবাকে একটা জলচৌকির উপর বসিয়ে ভেতরে চলে যায়। আর আসে না। পরীবানু ঘ্যানঘ্যান করে কাঁদে। মীর আলি বসে থাকে চুপচাপ।

তার কিছুক্ষণ পর পঞ্চাশ জন সৈন্যের ছোট একটা দল গ্রামে এসে ঢোকে। মার্চটার্চ না, এলোমেলোভাবে চলা। তাদের পায়ের বুটে কোনো শব্দ হয় না। তারা যায় মীর আলির বাড়ির সামনে দিয়ে। এবং তাদের এক জন মীর আলির চোখে পাঁচ-ব্যাটারি টর্চের আলো ফেলে । মীর আলি কিছু বুঝতে পারে না। শুধু উঠোনে বসে থাকা কুকুরটা তারস্বরে ঘেউঘেউ করতে থাকে। মীর আলি ভীত স্বরে ডাকে, 'বদি, ও বদি। বদিউজ্জামান।'

কুকুরটি একসময় আর ডাকে না। দলটির পেছনে-পেছনে কিছুদূর গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, তারপর দ্রুত ফিরে আসে মীর আলির কাছে। মীর আলি উঁচু গলায় ডাকে, ' ও বদি, ও বদিউজ্জামান।'

'কী হইছে? বেহুদা চিল্লান কেন?'

'বাড়ির সামনে দিয়া কারা যেন গেল।'

'আরে দুত্তোরি! যত ফালতু ঝামেলা! চুপ কইরা বইয়া থাকেন।'

মীর আলি চুপ করে যায়। চুপ করে থাকে কুকুরটিও। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। তারা টের পায়।

গ্রামের নাম নীলগঞ্জ। পহেলা মে। উনিশ শ' একাত্তর। ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক এক জন মেজর—এজাজ আহমেদ। কাকুল মিলিটারি একাডেমির একজন কৃতী ক্যাডেট। বাড়ি পেশোয়ারের এক অখ্যাত গ্রামে। তার গাঁয়ের নাম—রেশোবা।

২

ময়মনসিংহ–ভৈরব লাইনের একটি স্টেশন নান্দাইল রোড।

ছোট্ট গরিব স্টেশন। মেল ট্রেন থামে না। লোকাল ট্রেন মিনিটখানেক থেকেই ফ্ল্যাগ উড়িয়ে পালিয়ে যায়। স্টেশনের বাইরে ইট–বিছানো রাস্তায় চার–পাঁচটা রিকশা ঠুনঠুন করে ঘন্টা বাজিয়ে যাত্রী খোঁজে। সুরেলা গলা শোনা যায়—'রুয়াইল বাজার যাওনের কেউ আছুইন? রুয়াইল বা–জা–র।'

রুয়াইল বাজার এ–অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার। নান্দাইল রোড থেকে সোজা উত্তরে দশ মাইল। খুবই খারাপ রাস্তা। বর্ষাকালে রিকশা চলে না। হেঁটে যেতে হয়। এঁটেল মাটিতে পা দেবে যায়, থিকথিকে ঘন কাদা। নান্দাইল রোড থেকে রুয়াইল বাজার আসতে বেলা পুইয়ে যায়।

বাজারটি অন্য সব গ্রাম্য বাজারের মতো। তবে স্থানীয় লোকদের খুব অহংকার একে নিয়ে। কী নেই এখানে? ধানচালের আড়ত আছে। পাটের গুদাম আছে। ধান ভাঙানোর কল আছে। চায়ের দোকান আছে। এমনকি রেডিও সারাবার এক জন কারিগর পর্যন্ত আছে। গ্রামের বাজারে এর চেয়ে বেশি কী দরকার!

রুয়াইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরো মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে। বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদী–নালা নেই যে নৌকা চলবে।

মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পুবদিকে সাত–আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গলা–মাঠ। কাঁটাঝোপ, বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশ কিছু গাব ও ডেফলজাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর গাছও আছে। জঙ্গলা–মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেই সব মোরতা কেটে এনে পাটি বোনা হয়। পাকা লটকনের খোঁজে বালক–বালিকারা বনের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু বর্ষাকালে কেউ যায় না সেদিকে। খুব সাপের উপদ্রব। বনে ঢুকে প্রতি বছরই দু–একটা গরু ছাগল সাপের হাতে মারা পড়ে।

জঙ্গলা–মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন, ত্রিশ–চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কাস্তের মতো দু' দিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে। পাখি–মারা জাল নিয়ে পাখি ধরে বাজারে বিক্রি করে পাখি–মারারা। চাষবাস যা হয় দক্ষিণের মাঠে। জমি উর্বর নয় কিংবা এরা ভালো চাষী নয়। ফসল ভালো হয় না। তবে শীতকালে এরা প্রচুর রবিশস্য করে। বর্ষার আগে–

আগে করে তরমুজ ও বাঙ্গি। দক্ষিণের জমিতে কোনো রকম যত্ন ছাড়াই এ দু'টি ফল প্রচুর জন্মায়।

গ্রামের অধিকাংশ ঘরেই খড়ের ছাউনি। সম্প্রতি কয়েকটি টিনের ঘর হয়েছে। বদিউজ্জামানের ঘরটি টিনের। তার হাতে এখন কিছু পয়সাকড়ি হয়েছে। টিনের ঘর বানানো ছাড়াও সে একটা সাইকেল কিনেছে। চালানো শিখে ওঠে নি বলে এখনো সে হেঁটেই মধুবন বাজারে যায়। সপ্তাহে এক বার নতুন সাইকেলটি ঝাড়পোঁছ করে।

গ্রামের একমাত্র পাকা দালানটি প্রকাণ্ড। দু' বিঘা জমির উপর একটা হুলস্থুল ব্যাপার। সুসং দুর্গাপুরের মহারাজার নায়েব চন্দ্রকান্ত সেন মশাই এ-বাড়ি বানিয়ে গৃহপ্রবেশের দিন সর্পাঘাতে মারা পড়েন। চন্দ্রকান্ত সেন প্রচুর ধনসম্পদ করেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সে-সবের কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি। সবার ধারণা সোনাদানা পিতলের কলসিতে ভরে তিনি যখ করে গেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা পেতলের কলসির খোঁজে প্রচুর খোঁড়াখুঁড়ি করেছে। কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। চন্দ্রকান্ত সেন মশায়ের বর্তমান একমাত্র উত্তরাধিকারী নীলু সেন প্রকাণ্ড দালানটিতে থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। দেখায় তার চেয়েও বেশি। নীলু সেনকে গ্রামে যথেষ্ট খাতির করা হয়। যাবতীয় সালিশিতে তিনি থাকেন। বিয়ে-শাদির কোনো কথাবার্তা তাঁকে ছাড়া কখনো হয় না। লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী।

এ-গ্রামে সবচে সম্পদশালী ব্যক্তি হচ্ছে জয়নাল মিয়া। প্রচুর বিষয়সম্পত্তির মালিক। মধুবন বাজারে তার দু'টি ঘরও আছে। লোকটি মেরুদণ্ডহীন। সবার মন রেখে কথা বলার চেষ্টা করে। গ্রাম্য সালিশিতে সবার কথাই সমর্থন করে বিচারসমস্যা জটিল করে তোলে। তবু সবাই তাকে মোটামুটি সহ্য করে। সম্পদশালীরা এই সুবিধাটি সব জায়গাতেই ভোগ করে।

দু' জন বিদেশি লোক আছেন নীলগঞ্জে। এক জন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। এত জায়গা থাকতে তিনি এই দুর্গম অঞ্চলে ইমামতি করতে কেন এসেছেন সে-রহস্যের মীমাংসা হয় নি। তিনি মসজিদেই থাকেন। মাসের পনের দিন জয়নাল মিয়ার বাড়িতে খান। বাকি পনের দিন পালা করে অন্য ঘরগুলিতে খান। কিছু দিন হল তিনি বিয়ে করে এই গ্রামে স্থায়ীভাবে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তাবটিতে কেউ এখনো তেমন উৎসাহ দেখাচ্ছে না। ধানী জমি দিতে পারে জয়নাল মিয়া। সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাচ্ছে। শুনেও না-শোনার ভান করছে।

দ্বিতীয় বিদেশি লোকটি হচ্ছে আজিজ মাস্টার। সে নীলগঞ্জ প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। প্রাইমারি স্কুল সরকারি সাহায্যে তিন বৎসর আগে শুরু হয়। উদ্দেশ্য বোধহয় একটিই—দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছানো। উদ্দেশ্য সফল হয় নি। শিক্ষকরা কেউ বেশি দিন থাকতে পারে না। খাতাপত্রে তিন জন শিক্ষক থাকার কথা। এখন আছে এক জন—আজিজ মাস্টার। লোকটি রুগ্‌ণ, নানান রকম অসুখবিসুখ। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে হাঁপানি। শীতকালে এর প্রকোপ হয়। গরমকালটা মোটামুটি ভালোই কেটে যায়।

আজিজ মাস্টার একজন কবি। সে গত তিন মাসে চার নম্বরি একটি রুলটানা খাতা কবিতা লিখে ভরিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি কবিতাই একটি রমণীকে উদ্দেশ্য করে লেখা, যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়েছে, যেমন—স্বপ্ন-রানী, কেশবতী,

অচিন পাখি ইত্যাদি। তার তিনটি কবিতা নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত *মাসিক কিষাণ* পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। আজিজ মাষ্টারের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে গ্রামের লোকজন ওয়াকিবহাল। তারা এই কবিকে যথেষ্ট সমীহ করে। সমীহ করার আরেকটি কারণ হল আজিজ মাষ্টার গ্রামের সবচেয়ে শিক্ষিত মানুষ। বি·এ· পর্যন্ত পড়েছিল। পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। তার আবার পরীক্ষা দেওয়ার কথা।

সে জয়নাল মিয়ার একটি ঘরে থাকে। তার স্ত্রীকে সে ভাবীসাব ডাকে কিন্তু তার বড় মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন বিচলিত বোধ করে। মেয়েটির নাম মালা। মাঝে–মাঝে মালা তাকে ভাত বেড়ে দেয়। সে–সময়টা আজিজ মাষ্টার বড় অস্বস্তি বোধ করে। সে যখন বলে 'মামা, আরেকটু ভাত দেই?' তখন কোনো কারণ ছাড়াই আজিজ মাষ্টারের কান–টান লাল হয়ে যায়। আজিজ মাষ্টার কয়েক দিন আগে 'মালা রানী' নামের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছে। কবিতাটি *কিষাণ পত্রিকায়* পাঠাবে কি না এ নিয়ে সে খুব চিন্তিত। হয়তো পাঠাবে।

নীলগঞ্জের যে–দিকটায় জলাভূমি, একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। গ্রামের সঙ্গে তাদের খুব একটা যোগ নেই। মাছ ধরার সিজনে জলমহালে মাছ মারতে যায়। আবার ফিরে আসে। কর্মহীন সময়টাতে চুরি–ডাকাতি করে। নীলগঞ্জের কেউ এদের ঘাঁটায় না।

গত বৎসর কৈবর্তপাড়ায় খুন হল একটা। নীলগঞ্জের মাতবররা এমন ভাব করলেন যেন তারা কিছুই জানেন না। থানা–পুলিশ কিছুই হল না। যার ছেলে খুন হল, সেই চিত্রা বুড়ি কিছু দিন ছোটাছুটি করল নীলু সেনের কাছে। নীলু সেন শুকনো গলায় বললেন, 'তোদের ঝামেলা তোরা মিটা। থানাওয়ালার কাছে যা।' বুড়ি ফোঁপাতে–ফোঁপাতে বলল, 'থানাওয়ালার কাছে গেলে আমারে দহের মইধ্যে পুইত্তা থুইব কইছে।' নীলু সেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। টেনে–টেনে বললেন, 'এদের ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না। রক্তগরম জাত। কি করতে কি করে।'

'বিচার অইত না?'

নীলু সেন তার জবাব দিতে পারলেন না। অস্পষ্টভাবে বললেন, 'এখন বাদ দে। পরে দেখি কিছু করা যায় কি না।'

বুড়ি আরো কিছুদিন ছোটাছুটি করল। এবং একদিন দেখা গেল কৈবর্তরা দল বেঁধে জলমহালে মাছ মারতে গিয়েছে, বুড়িকে সঙ্গে নেয় নি। বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করল কিছু দিন। নীলু সেনের দালানের এক প্রান্তে থাকতে লাগল। চরম দুর্দিন। কৈবর্তরা ফিরে এল তিন মাস পর—কিন্তু বুড়ির জায়গা হল না। সে এ–বাড়ি ও–বাড়ি ভিক্ষা করে খেতে লাগল। হতদরিদ্র নীলগঞ্জের প্রথম ভিক্ষুক।

সব গ্রামের মতো এই গ্রামে এক জন পাগলও আছে। মতি মিয়ার শালা নিজাম। সে বেশির ভাগ সময়ই সুস্থ থাকে। শুধু দু'–এক দিন মাথা গরম হয়ে যায়। তখন তার গায়ে কোনো কাপড় থাকে না। গ্রামের এ–মাথা থেকে ও–মাথা পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে থাকে। দুপুরের রোদ খুব বেড়ে গেলে মধুবন জঙ্গলায় ঢুকে পড়ে। 'পাগলদের সাপে কাটে না' প্রবাদটি হয়তো সত্যি। নিজাম বহাল তবিয়তেই বন থেকে বেরিয়ে আসে। ছোটাছুটি করা এবং বনের ভেতরে বসে থাকা ছাড়া সে অন্য কোনো উপদ্রব করে না। গ্রামের পাগলদের গ্রামবাসীরা খুব স্নেহের চোখে দেখে। তাদের প্রতি অন্য

এক ধরনের মমতা থাকে সবার।

৩

চিত্রা বুড়ি রাতে একনাগাড়ে কখনো ঘুমায় না।

ক্ষণে-ক্ষণে জেগে উঠে চেঁচায়, 'কেলা যায় গো? লোকটা কে?'

তার ঘুমোবার জায়গাটা হচ্ছে সেনবাড়ির পাকা কালীমন্দিরের চাতাল। নীলু সেন তাকে থাকবার জন্যে একটা ঘর দিয়েছিলেন। সেখানে নাকি তার ঘুম হয় না। দেবীমূর্তির পাশে সে বোধহয় এক ধরনের নিরাপত্তা বোধ করে। গভীর রাতে দেবীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হয়, 'দেখিস হেই মা কালী, হেই গো নেংটা বেটি, আমার পুতরে যে মারছে তুই তার কইল্‌জাটা টাইন্যা খা। তরে আমি জোড়া পাঠা দিমু। বুক চিইরা রক্ত দিমু—হেই মা কালী, দেখিস রে বেটি, দেখিস।'

মা কালী কিছু শোনেন কি না বলা মুশকিল। কিন্তু চিত্রা বুড়ির ধারণা, তিনি শোনেন এবং তিনি যে শুনছেন তার নমুনাও দেন। যেমন—এক রাত্রিতে খলখল হাসির শব্দ শোনা গেল। বুড়ির রক্ত জল হয়ে যাবার মতো অবস্থা। সে কাঁপা গলায় ডাকল, 'হেই মা, হেই গো নেংটা বেটি!' হাসির শব্দ দ্বিতীয় বার আর শোনা গেল না। দেবীরা তাঁদের মহিমা বারবার করে দেখাতে ভালবাসেন না।

চিত্রা বুড়ি আজ রাতেও মা কালীর সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা বলল। জোড়া পাঁঠার আশ্বাস দিয়ে ঘুমোতে গেল। তারপর জেগে উঠে চেঁচাল, 'কেলা যায় গো, লোকটা কে?' কেউ জবাব দিল না, কিন্তু বুড়ির মনে হল অনেকগুলি মানুষ যেন এদিকে আসছে। শব্দ করে পা ফেলছে। হুঁ হাঁ হুঁ হাঁ এ-রকম একটা আওয়াজও আসছে। ডাকাত নাকি? চিত্রা বুড়ি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দিয়ে মিলিটারির দলটি পার হল। আলো কম। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না।

চিত্রা বুড়ি কিছু বুঝতে পারল না। এরা কারা? এই রাতে কোত্থেকে এসেছে? বুড়ি দেখল, সেনবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েক বার টর্চের আলো ফেলল। তার মানে কি ডাকাত? কিন্তু সেনবাড়িতে ডাকাত আসার কথা নয়। সেনরা এখন হতদরিদ্র। এই বিশাল বাড়ির ইটগুলো ছাড়া ওদের আর কিছুই নেই।

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। জুম্মাঘরের কাছে এসে আবার সেনবাড়ির উপর টর্চের আলো ফেলল। কোন দিকে যাচ্ছে? কৈবর্তপাড়ার দিকে? ওদের আগেভাগে খবর দেওয়া দরকার। সেনবাড়ির পেছন দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে খবর দেবে? চিত্রা বুড়ির কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগছে। এই রাতের বেলা দল বেঁধে এরা কেন আসবে?

না, কৈবর্তপাড়ার দিকে যাচ্ছে না। জুম্মাঘর পেছনে ফেলে এরা সড়কে উঠে গেল। টর্চের আলো এখন আর ফেলছে না। বুড়ির মনে হল এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে। আজিজ মাস্টারকে খবর দেওয়া দরকার। কিন্তু তারও আগে খবর দেওয়া দরকার কৈবর্তপাড়ায়। বিপদের সময় নিজ গোত্রের মানুষের কথাই প্রথম মনে পড়ে।

চার-পাঁচটা কুকুর একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে। এরা কিছু টের পেয়েছে। কুকুর- বেড়াল অনেক কিছু আগেভাগে জানে। বুড়ি কালীমন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এল। সে কোন

দিকে যাবে মনস্থির করতে পারছে না।

গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে এটা প্রথম বুঝতে পারলেন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব। পাকা মসজিদের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিনি সূরা ইয়াসিন পড়ছিলেন। আজান দেবার আগে তিনি তিন বার সূরা ইয়াসিন পড়েন। দ্বিতীয় বার পড়বার সময় অবাক হয়ে পুরো দলটাকে দেখলেন। এরা স্কুলঘরের দিকে যাচ্ছে।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত তিনি ব্যাপারটা বুঝতেই পারলেন না। সূরা ইয়াসিন শেষ করে দীর্ঘ সময় মসজিদের সিঁড়িতে বসে রইলেন। অন্ধকার এখনো কাটে নি। পাখপাখালি ডাকছে। ইমাম সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না—এখানে বসে থাকবেন, না খবর দেওয়ার জন্যে ছুটে যাবেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে হল সিঁড়িতে এ-রকম প্রকাশ্যে বসে থাকা ঠিক না। মসজিদের ভেতরে থাকা দরকার। কিন্তু নীলগঞ্জের মসজিদে তিনি কখনো একা ঢোকেন না। এই মসজিদে জীন নামাজ পড়ে—এ-রকম একটা প্রবাদ আছে। অনেকেই দেখেছে। তিনি অবিশ্যি এখনো দেখেন নি। কিন্তু তাঁর ভয় করে।

একা বসে থাকতে-থাকতে তাঁর মনে হল, এই যে তিনি দেখলেন একদল মিলিটারি, এটা চোখের ভুল নয় তো? নান্দাইল রোডে মিলিটারি আসে নি, সোহাগীতে আসে নি—এখানে আসবে কেন? এখানে আছেটা কী? নেহায়েতই গণ্ডগ্রাম।

ইমাম সাহেব ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। স্কুলঘর বাঁশবনের আড়ালে পড়েছে—কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুসুল্লিরা কেউ আসছে না কেন? নাকি মিলিটারির খবর জেনে গেছে সবাই? তাঁর প্রবল ইচ্ছে হতে লাগল নামাজ না-পড়েই ঘরে ফিরে যেতে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে, অথচ কারো দেখা নেই।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবার পর মতি মিয়াকে আসতে দেখা গেল। মতি মিয়া একটা মামলায় জড়িয়ে ইদানীং ধর্মেকর্মে অতিরিক্ত রকমের উৎসাহী হয়ে পড়েছে। ইমাম সাহেব নিচু গলায় বললেন, 'এই মতি, কিছু দেখলা?'

'কী দেখুম? কিসের কথা কন?'

'কিছু দেখ নাই?'

'নাহ্। বিষয়ডা কী?'

ইমাম সাহেব আর কিছু না-বলে চিন্তিত ভঙ্গীতে আজান দিতে গেলেন। আজান শেষ করে মতি মিয়াকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ইস্কুলঘরের কাছে কিছুই দেখ নাই?'

'নাহ্। ব্যাপারডা কি ভাইঙ্গা কন।'

'মনে হয় গেরামে মিলিটারি ঢুকছে।'

'কী ঢুকছে?'

'মিলিটারি।'

'আরে কী কন? এই গেরামে মিলিটারি আইব ক্যান?'

'আমি যাইতে দেখলাম।'

'চউক্ষের ধান্ধা। আন্ধাইরে কি দেখতে কি দেখছেন। নান্দাইল রোডে তো এখন তক মিলিটারি আসে নাই।'

'তুমি জানলা ক্যামনে?'

'আমার শালা আইছে গতকাইল। নেজামের বড় ভাই।'

'আমি কিন্তু নিজের চউক্ষে দেখলাম।'

'আরে না। মিলিটারি আইলে এতক্ষণে গুলি শুরু হইয়া যাইত। মিলিটারি কি সোজা জিনিস?'

ইমাম সাহেব নামাজ শুরু করবার আগেই আরো তিন জন নামাজী এসে পড়ল। তারাও কিছু জানে না। এক জন এসেছে স্কুলঘরের সামনে দিয়ে, সেও কিছু দেখে নি।

ইমাম সাহেব আজ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত নামাজ পড়লেন। নামাজের শেষে সাধারণত তিনি হাদিস–কোরানের দুই–একটি কথা বলেন। আজ কিছুই বললেন না। বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বেশ আলো চারদিকে, অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। জোড়া শিমুল গাছের কাছে এসে তিনি আড়চোখে স্কুলঘরের দিকে তাকালেন। বারান্দায় সারি–সারি সৈন্য বসে আছে। ইমাম সাহেবের মনে হল স্কুল কম্পাউণ্ডের গেটের কাছে দাঁড়ানো একটা লোক হাত ইশারা করে তাঁকে ডাকছে। লোকটির পরনে ফুল প্যান্ট এবং নীল রঙের একটা হাফ শার্ট। কিন্তু তাঁকে ডাকছে কেন? নাকি তিনি ভুল দেখছেন। ইমাম সাহেবের কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম জমল। তিনি এক বার আয়াতুল কুর্সি ও তিন বার দোয়া ইউনুস পড়ে স্কুলঘরের দিকে এগুলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটিও এগিয়ে আসছে তার দিকে। ব্যাপার কী? এ কে? তিনি অতি দ্রুত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন, 'লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জোয়ালেমিন।' এই দোয়াটি খুব কাজের। হযরত ইউনসু আলায়হেস সালাম মাছের পেটে বসে এই দোয়া পড়েছিলেন।

নীল শার্ট পরা লোকটা এগিয়ে আসছে। কী চায় সে?

'আপনি কে?'

'আমি এই গেরামের ইমাম।'

'আচ্ছালামু আলায়কুম ইমাম সাহেব।'

'ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ্।'

'আপনি একটু আসেন আমার সাথে।'

'কই যাইতাম?'

'আসেন। মেজর সাব আপনাকে ডাকেন। ভয়ের কিছু নেই। আসেন।'

ইমাম সাহেব তিন বার ইয়া মুকাদ্দেমু পড়ে ডান পা আগে ফেললেন। সঙ্গের নীল শার্ট পরা লোকটি মৃদু স্বরে বলল, 'এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ভয়ের কিছুই নাই।'

৪

আজিজ মাস্টারের অনিদ্রা রোগ আছে।

অনেক রাত পর্যন্ত তাকে জেগে থাকতে হয় বলেই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে হয়। আজ তাকে ভোরের আলো ফোটার আগেই জাগতে হল। কারণ স্কুলের দপ্তরি ও দারোয়ান রাসমোহন প্রচণ্ড শব্দে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে, এক্ষুণি

আজিজ মাস্টারকে ঘর থেকে বের করতে হবে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে আজিজ মাষ্টার কথা বলল, 'এই রাসমোহন, কী ব্যাপার?'

'আপনারে ডাকে, আপনারে ডাকে।'

'কে ডাকে?'

'মিলিটারি। গেরামে মিলিটারি আসছে। ইস্কুলঘরে।'

'কী বলছিস রাসমোহন?'

'আপনারে স্যার ডাকে।'

আজিজ মাস্টার দরজা খুলে দেখল রাসমোহনের থুতনি বেয়ে ঘাম পড়ছে। গায়ের ফতুয়াটাও ঘামে ভেজা। স্কুল থেকে দৌড়ে এসেছে বোধহয়। শব্দ করে শ্বাস টানছে। রাসমোহন আবার বলল, 'মিলিটারি আপনারে ডাকে স্যার।' আজিজ মাস্টার রাসমোহনের কথা মোটেও বিশ্বাস করল না। সময়টা খারাপ। খাকি পোশাকের একজন পিওন দেখলেও সবাই ভাবে পাঞ্জাবি মিলিটারি। রাসমোহনের রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়েছে। থানাওয়ালারা কেউ এসেছে কেন্দুয়া থেকে। খুব সম্ভব চিত্রা বুড়ির ছেলের ব্যাপারে। মার্ডার কেইসে পুলিশের খুব উৎসাহ। দল বেঁধে চলে আসে। নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানেও তাই হয়েছে। আজিজ মাস্টার অনেকখানি সময় নিয়ে হাত-মুখ ধুল। তার মাথায় চুল নেই, তবু যত্ন করে চুল আঁচড়াল। পরিষ্কার একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে রাস্তায় বেরুল। অর্ধেক পথ আসার পর তার মনে পড়ল, চাবি ফেলে এসেছে। আবার ফিরে গেল চাবি আনতে। বাড়ি ফিরবার পথে সত্যি-সত্যি বুঝল গ্রামে মিলিটারি এসেছে। তার মতি মিয়ার সঙ্গে দেখা হল। রতন মাঝির সঙ্গে দেখা হল। বাড়ি ঢোকবার মুখে জয়নাল মিয়াকেও ছাতা মাথায় দিয়ে আসতে দেখা গেল। রাসমোহন এদের প্রত্যেককে এক বার এক বার করে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল।

রাসমোহনের বর্ণনা মতো—সে স্কুলঘরের বারান্দায় ঘুমুচ্ছিল। তখনো চারদিক অন্ধকার। কে যেন তার পায়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে টর্চের আলো ফেলল। সে উঠে বসে দেখে স্কুলে মিলিটারি গিজগিজ করছে।

জয়নাল মিয়া নিচু গলায় বলল, 'আন্দাজ কত জন হইব?'

'চাইর-পাঁচ শ'র কম না।'

'কও কী তুমি!'

'বেশিও হইতে পারে। সবটি মস্ত জোয়ান।'

'জোয়ান তো হইবই। মিলিটারি দুবলা-পাতলা হয় নাকি?

'হাতে অস্ত্রপাতি আছে?'

জয়নাল মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, 'অস্ত্রপাতি তো থাকবই। এরা কি বিয়া করতে আইছে?'

আজিজ মাস্টার গম্ভীর গলায় বলল, 'তারপর কী হয়েছে রাসমোহন?'

'তারা আমার নাম জিগাইল।'

আজিজ মাস্টার বলল, 'কোন ভাষায়? উর্দু না ইংরেজি?'

'বাংলায়। পরিষ্কার জিগাইল—তোমার নাম কি? তুমি কে? কী কর?'

'তা কীভাবে হয়? এরা তো বাংলা জানে না।'

'আমি স্যার পরিষ্কার হুনলাম। নিজের কানে হুনলাম।'

'তারপর বল। তারপর কী হল?

'আমি কইলাম—আমার নাম রাসমোহন। আমি স্কুলের দপ্তরি। তখন তারা কইল—হেডমাস্টাররে ডাইক্যা আন।'

'বাংলায় বলল?'

'জ্বি স্যার।'

'আরে কী যে বলে পাগল-ছাগলের মতো! এরা বাংলা জানে নাকি? কি শুনতে কি শুনেছ।'

আজিজ একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে। এবং প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। খুব খারাপ লক্ষণ। এক্ষুণি হাঁপানির টান শুরু হবে। অতিরিক্ত উত্তেজনায় তার হাঁপানির টান ওঠে। এখন সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে না জেনেও আজিজ মাস্টার লম্বা-লম্বা টান দিতে শুরু করল। সে সাধারণত জয়নাল মিয়ার সামনে সিগারেট খায় না।

জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি যাও মাস্টার, বিষয়ডা কি জাইন্যা আস।'

'আমি, আমি কী জন্যে যাব?'

'আরে, ডাকতাছে তোমারে। তুমি যাইবা না তো যাইবটা কে?'

আজিজ মাস্টারের সত্যি-সত্যি হাঁপানির টান উঠে গেল। সিগারেট ফেলে দিয়ে সে লম্বা-লম্বা শ্বাস নিতে শুরু করল। জয়নাল মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, 'এরা এইখানে থাকবার জন্যেই আসে নাই, বুঝলা? যাইতাছে অন্য কোনোখানে। ভয়ের কিছু নাই। একটা পাকিস্তানি পতাকা হাতে নিয়া যাও। একটা পতাকা আছে না? বাঁশের আগায় বান্ধ।'

'আমি একলা যাব? বলেন কী?'

'একসঙ্গে বেশি মানুষ যাওয়া ঠিক না।'

'ঠিক-বেঠিক যাই হোক, আমি একা যাব না।'

'এই রকম করতাছ কেন মাস্টার? এরা বাঘও না, ভাল্লুকও না।'

'একা যাব না। আপনারা চলেন আমার সাথে।'

সকাল প্রায় সাতটার দিকে ছ' জনের একটি ছোট্ট দলকে একটি পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে ইস্কুলঘরের দিকে এগোতে দেখা গেল। রোগা আজিজ মাস্টার দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছে। সে ইস্কুলঘরের কাছাকাছি এসে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'পাকিস্তান!' দলের অন্য সবাই আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বলল—'জিন্দাবাদ!!'

'কায়দে আযম!'

'জিন্দাবাদ!!'

'লিয়াকত আলি খান!'

'জিন্দাবাদ!!'

'মহাকবি ইকবাল!'

'জিন্দাবাদ!!'

৫

রোদ উঠে গেছে।।

বৈশাখ মাস—অল্প সময়েই রোদ ঝাঁঝাল হয়ে ওঠে।

ছোট্ট দলটি, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে আজিজ মাস্টার, রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে। তাদের মুখ রক্তশূন্য। তারা বুকের মাঝে এক ধরনের কাঁপুনি অনুভব করছে।

রাস্তার ওপাশে চার–পাঁচটা জারুল গাছ। গাছের নিচে গেলে ছায়া পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে যাওয়া ঠিক হবে কি না আজিজ মাস্টার বুঝতে পারছে না। তারা জড়াজড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধ্বনি দেয়। আড়চোখে মিলিটারিদের দিকে তাকায়। সরাসরি তাকাতে সাহসে কুলোয় না। সমস্ত বারান্দা জুড়ে মিলিটারিরা ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। কেউ বসে আছে। কেউ মাথার নিচে হ্যাভারস্যাক দিয়ে ঘুমের মতো পড়ে আছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে আসা দলটির প্রতি তাদের কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তাদের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের মতো নির্লিপ্ত। যেন জগতের কোনো কিছুতেই তাদের কিছু আসে–যায় না।

পাকিস্তানের ফ্ল্যাগটি মতি মিয়ার হাতে। সে হাত উঁচু করে ফ্ল্যাগটি দোলাচ্ছিল—হাত ব্যথা হয়ে গেছে, কিন্তু নামাবার সাহস হচ্ছে না। আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কয়েক বার কাশল। সেই শব্দে বারান্দায় বসা কয়েক জন তাকাল তার দিকে। আজিজ মাস্টার প্রাণপণে কাশি চাপতে চেষ্টা করল। সময় খারাপ। এ–রকম সময়ে কাউকে অযথা বিরক্ত করা ঠিক না। কিন্তু ক্রমাগত কাশি উঠছে। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল উঠোনে চেয়ার পেতে যে–অফিসারটি বসে আছেন, তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

অত্যন্ত রূপবান একজন মানুষ। মিলিটারি পোশাকেও তাঁকে রাজপুত্রের মতো লাগছে। এঁর চোখে–মুখে কোনো ক্লান্তি নেই। তবে বসে থাকার ভঙ্গিটি শ্রান্তির ভঙ্গি। তিনি তাঁর সামনের টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। পায়ে খয়েরি রঙের মোজা। মানুষটি প্রকাণ্ড, তবে সেই তুলনায় পায়ের পাতা দু'টি ছোট।

তাঁর কাছাকাছি যে–রোগা লোকটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখতে বাঙালিদের মতো লাগছে। তার গায়ে চকচকে নীল রঙের একটা শার্ট। এই লোকটি খুব ঘামছে। ময়লা একটা রুমালে ক্রমাগত ঘাড় মুছছে। অফিসারটি মৃদু স্বরে কী–যেন বলল নীল শার্ট পরা লোকটিকে। নীল শার্ট তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার সাহেব কে?'

আজিজ মাস্টারের বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগল।

'কে আপনাদের মধ্যে হেডমাস্টার?'

মতি মিয়া আজিজ মাস্টারের পিঠে মৃদু ধাক্কা দিল। আজিজ মাস্টার কাশির বেগ থামাতে–থামাতে বলল, 'জ্বি আমি।'

'আপনি থাকেন। অন্য সবাইকে যেতে বলেন। যান ভাই, আপনারা সবাই যান। ভয়ের কিছুই নাই।'

আজিজ মাস্টার একা দাঁড়িয়ে রইল। অন্যরা মনে হল হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তবে তারা চলেও গেল না। জুম্মাঘরের কাছে ছাতিম গাছের নিচে বসে রইল চুপচাপ।

ব্যাপারটা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাস্টার ফিরে না–আসা পর্যন্ত কিচ্ছু পরিষ্কার হবে না।

মতি বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল। সে জয়নাল মিয়ার সামনে বিড়ি খায় না। এই কথা তার মনে রইল না। সময়টা খারাপ। এই সময় কোনো কিছু মনে থাকে না। ছোট চৌধুরীও সিগারেট ধরালেন। তিনি সকাল থেকেই ঘামছেন।

মতি মিয়া বলল, 'ভয়ের কিছু নাই, কি কন?'

'নাহ্, ভয়ের কি? এরা বাঘও না, ভাল্লুকও না।'

'একেবারে খাঁটি কথা।'

'অন্যায় তো কিছু করি নাই। অন্যায় করলে একটা কথা আছিল।'

'একেবারে খাঁটি কথা। অতি লেহ্য কথা।'

জয়নাল মিয়া উৎসাহিত বোধ করে। মতি বলল, 'নীলু চাচার বাড়িত যাই চলেন।' কথাটা তার খুব মনে ধরে। কিন্তু আজিজ মাস্টার ফিরে না–আসা পর্যন্ত নড়তেও ইচ্ছে করে না। রোদ চড়তে শুরু করে। ছাতিম গাছের নিচে একটি দু'টি করে মানুষ জমতে শুরু করে। সবার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। ঝাঁ–ঝাঁ করছে রোদ।

উত্তর বন্দে বোরো ধান পেকে আছে। কাটতে হবে। কিছু–কিছু জমিতে পাট দেওয়া হয়েছে। খেত নিড়ানির সময় এখন। দক্ষিণ বন্দে আউশ বোনা হবে। কিন্তু আজ মনে হয় এ–গ্রামের কেউ কোথাও যাবে না। আজকের দিনটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে সবাই অপেক্ষা করবে। এ–গ্রামে বহুদিন এ–রকম ঘটনা ঘটে নি।

বদিকে দেখা গেল ফর্সা জামা গায়ে দিয়ে হনহন করে আসছে। তার বগলে ছাতা। ছাতিম গাছের নিচে একসঙ্গে এতগুলি মানুষ দেখে হকচকিয়ে গেল।

'বিষয় কি?'

মতি মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জান না কিছু?'

'কী জানুম?'

'আরে মুসিবত। জান লইয়া টানাটানি, আর—কিছুই জান না?'

বদি চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকায়। কিছু বুঝতে পারে না। জয়নাল মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'গেরামে মিলিটারি আইছে।'

'এইটা কী কন? এইখানে মিলিটারি আইব ক্যান?'

'স্কুলঘরে গিয়া নিজের চউক্ষে দেখ। আজিজ মাস্টাররে রাইখ্যা দিছে।'

'এ্যাঁ!'

'আজ মধুবনে গিয়া কাম নাই, বাড়িত যাও।'

বদি রাস্তার উপর বসে পড়ে। ফিসফিস করে বলে, 'কী সর্বনাশ!'

জয়নাল মিয়া বিরক্ত হয়ে বলে, 'সর্বনাশের কী আছে? আমরা কী করলাম? কিছু করছি আমরা?'

বদি মুখ লম্বা করে বসে থাকে। একসময় মৃদু স্বরে বলে, 'মুসলমানের জন্যে ভয়ের কিছুই নাই। এরা মুসলমানদের খুব খাতির করে। তবে পাক্কা মুসলমান হওয়া লাগে। চাইর কলমা জিজ্ঞেস করে।'

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। চার কলেমা কারো জানা নেই। বদি উৎসাহিত হয়ে বলে, 'সুন্নত হইছে কি না এইটাও দেখে। কাপড় খুইলা দেখে।'

'তুমি জানলা ক্যামনে?'

'নান্দাইল রোডে হুনছি। সুন্নত না থাকলেই দুম। গুল্লি।'

'কও কী তুমি!'

'মিলিটারি মানুষ, রাগ বেশি। আমরার মতো না। রাগ উঠলেই দুম।'

বদি একটি বিড়ি ধরিয়ে দ্রুত টানতে থাকে। তার মধুবনে যাওয়া অত্যন্ত দরকার। কে জানে হয়তো মধুবনেও মিলিটারি এসে দোকানপাট জ্বালিয়ে দিয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল। মতি মিয়া বলল, 'যাও কই?' বদি তার উত্তর না–দিয়ে উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করল। ইস্কুলঘরকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে। হাঁটতে হবে অনেকটা পথ।

কড়া রোদ উঠছে। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। চারদিকে ঝাঁ–ঝাঁ করছে রোদ। বদি হনহন করে ছুটছে।

৬

রোগা নীল শার্ট পরা লোকটি বাঙালি।

সে আজিজ মাস্টারের দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'ইনি মেজর এজাজ আহমেদ, ইনারে সালাম দেন।' আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো বলল, 'স্লামালিকুম।' মেজর এজাজ পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'আপনার নাম কি?'

'জ্বি, আমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক।'

'সে ইট এগেইন।'

আজিজ মাস্টার নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকাল। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নামটা আরেকবার বলেন। স্পষ্ট করে বলেন। গলায় জোর নাই?

আজিজ মাস্টার বলল, 'আজিজুর রহমান মল্লিক।'

'আপনি বসুন।'

কোথায় বসতে বলছে? বসার দ্বিতীয় কোনো চেয়ার নেই। মাটিতে বসতে বলছে নাকি? আজিজ মাস্টারের গলা শুকিয়ে গেল। রোগা লোকটি স্কুলঘর থেকে একটি চেয়ার নিয়ে এল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'বসেন। স্যার বসতে বলেছেন, বসেন।' আজিজ মাস্টার সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বসল। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বললেন না। সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার, ভালো আছেন?' রোগা লোকটি বলল, 'শুনেন ভাই, আগ বাড়িয়ে কিছু বলতে যাবেন না। যা জিজ্ঞেস করবে শুধু তার জবাব দিবেন। ইনি লোক ভালো, ভয়ের কিছু নাই। স্যার বাংলা বলতে পারেন না, কিন্তু ভালো বুঝেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনার ভয়ের কিছু নাই। আরাম করে বসেন।'

আজিজ মাস্টার আরাম করে বসার একটা ভঙ্গি করল। মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। প্যাকেটটি বাড়িয়ে দিলেন আজিজ মাস্টারের দিকে। আজিজ মাস্টার ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, 'স্যার দিচ্ছেন যখন নেন। বললাম না—ইনি লোক ভালো।' আজিজ মাস্টার একটা সিগারেট নিল। কী আশ্চর্য!

মেজর সাহেব নিজে সিগারেটটি ধরিয়ে দিলেন। আজিজ মাস্টার তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেল। অত্যন্ত শরিফ আদমি।

পরবর্তী সময়ে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল। মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, আজিজ মাস্টার জবাব দিল বাংলায়। কিছু প্রশ্ন আজিজ মাস্টার বুঝতে পারল না। নীল শার্ট পরা লোকটি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল।

'তোমার নাম আজিজুর রহমান মল্লিক?'

'জ্বি স্যার।'

'মল্লিক মানে কি?'

'জানি না স্যার।'

'এই গ্রামে কত জন মানুষ?'

'জানি না স্যার।'

'কত জন হিন্দু আছে?'

'জানি না স্যার।'

'তুমি দেখি কিছুই জান না!'

'স্যার, আমি বিদেশি মানুষ।'

'বিদেশি মানুষ মানে? তুমি পাকিস্তানি না?'

'জ্বি স্যার।'

'তাহলে তুমি বিদেশি হলে কীভাবে?'

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। আজিজ মাস্টারের মাথায় কোনো জবাব এল না।

'তুমি ইকবাল জিন্দাবাদ বলছিলে, ইকবাল কে?'

'কবি স্যার। বড়ো কবি। মহাকবি।'

'তুমি তার কবিতা পড়েছ?'

'জ্বি–না স্যার।'

'পড় নাই—চীন ও আরব হামারা সারা জাঁহা হ্যায় হামরা?'

'জ্বি–না স্যার।'

মেজর সাহেব আরেকটি সিগারেট ধরালেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন। আজিজ মাস্টার লক্ষ করল লোকটিকে দূর থেকে যত অল্পবয়স্ক মনে হচ্ছিল আসলে তার বয়স তত অল্প নয়। চোখের নিচে কালি। কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ। কত বয়স হতে পারে? পঁয়ত্রিশের কম নয়। আজিজ মাস্টারের বয়স আটত্রিশ। এই লোকটি তার চেয়ে তিন বছরের ছোট। অথচ এই লোকটির সামনে নিজেকে কেমন কেঁচোর মতো লাগছে।

মেজর সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। পা থেকে মোজা জোড়া টেনে খুলে ফেললেন। আবার প্রশ্ন–উত্তর শুরু হল।

'এ–গ্রামে কোনো দুষ্ট লোক আছে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'মুক্তিবাহিনী আছে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'তুমি ঠিক জান?'

'জ্বি স্যার। এই গ্রামের সবাইকে আমি চিনি।'

'তোমার ধারণা এই গ্রামে মুক্তিবাহিনী নেই?'

'জ্বি–না।'

মেজর সাহেব মৃদু হাসলেন। কেন হাসলেন কে জানে। তিনি কি বিশ্বাস করছেন না? আজিজ মাস্টার আবার বলল, 'মুক্তিবাহিনী নাই স্যার।'

'শেখ মুজিবের লোকজন আছে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'তুমি জ্বি–না স্যার ছাড়া অন্য কিছু বলছ না কেন? তুমি কি ভয় পাচ্ছ? ভয় পাচ্ছ তুমি?'

'জ্বি–না স্যার।'

'গুড। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার দিকে ভালো করে তাকাও। তাকাও ভালো করে।'

আজিজ মাস্টার তাকাল। মেজর সাহেবের চোখ দু'টি তার কাছে একটু নীলচে মনে হল। বিড়ালচোখো নাকি?

'আমাকে দেখে কি মনে হয় আমি খারাপ লোক?'

'জ্বি–না স্যার।'

'কফি খাবে?'

আজিজ মাস্টার চোখ তুলে তাকাল। রোগা লোকটি বলল, 'খেতে চাইলে বলেন—খাব। আমার দিকে তাকান কেন? অভ্যাস না থাকলে বলেন—খাব না। ব্যস। বারবার আমার দিকে তাকাবেন না।'

'কি, কফি খাবে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'না কেন, খাও। কফি তৈরি হচ্ছে। তুমি কি কফির সঙ্গে ক্রীম খাও?'

আজিজ মাস্টার না–বুঝেই মাথা নাড়ল। কফি এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। অতি বিস্বাদ জিনিস। আজিজ মাস্টার চুকচুক করে কফি খেতে লাগল। কাপ নামিয়ে রাখার সাহস হল না।

'বুঝলে আজিজ, পাকিস্তানি মিলিটারির নামে আজগুবি সব গল্প ছড়ানো হচ্ছে। আমরা নাকি কোথায় কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দু'টি মুক্তিবাহিনীর ছেলেকে মেরেছি। গল্পটা তোমার বিশ্বাস হয়?'

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমরা কাঠুরে হলে সেটা করতাম। কিন্তু আমরা কাঠুরে নই, আমরা সৈনিক। আমরা গুলি করে মারব। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার।'

'হিন্দুস্থান বেতারে এ–সব প্রচার চালাচ্ছে, এবং অনেকেই এ–সব শুনছে। ঠিক না? বল, ঠিক বলছি কি না।'

'জ্বি–স্যার, ঠিক।'

'আচ্ছা, এ–গ্রামে ট্র্যানজিস্টার আছে কার কার? তোমার আছে?'

আজিজ মাস্টারের গলায় কফি আটকে গেল। তার আছে এবং সে স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে।

'কি, আছে?'

'জ্বি স্যার।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই শোন না।'

'মাঝে মাঝে শুনি স্যার।'

'শুনলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না। ঠিক না?'

'মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয়।'

'আজিজ।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি একজন সৎলোক। অন্য কেউ হলে বলত বিশ্বাস হয় না। আমার মনে হয় তুমি মিথ্যা একেবারেই বলতে পার না। আচ্ছা এখন বল, আর কার ট্র্যানজিস্টার আছে?'

'নীলু সেনের আছে। জয়নাল মিয়ার আছে।'

'ওরা কেমন লোক?'

'ভালো লোক স্যার। নির্বিরোধী মানুষ। এই গ্রামে খারাপ মানুষ কেউ নাই।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও। ভয়ের কিছু নেই।'

আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, মেজর সাহেব একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

'স্লামালিকুম স্যার।'

'ওয়ালাইকুম সালাম।'

আজিজ মাস্টারের কেন যেন মনে হল এক্ষুণি তাকে আবার ডাকা হবে। সে এগোতে লাগল খুব সাবধানে। কিন্তু কেউ তাকে ডাকল না। প্রায় ত্রিশ গজের মতো যাওয়ার পর সে ভয়ে-ভয়ে এক বার পেছনে তাকাল—মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তার সঙ্গের রোগা লোকটিও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে। আজিজ মাস্টারের বুক ধক করে উঠল। কেন উঠল কে জানে। এক বার পেছন ফিরে আবার মুখ ফিরিয়ে চলে যাওয়া যায় না। আজিজ মাস্টার দ্বিতীয় বার বলল, 'স্লামালিকুম।'

মেজর সাহেব তখন তাকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'এই যে মাস্টার সাহেব, এদিকে আসেন ভাই। স্যার ডাকেন।' আজিজ মাস্টার ফিরে এল। মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'শুনলাম তুমি কবিতা লেখ।' আজিজ মাস্টার বেকুবের মতো তাকাল। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

'এখানকার মসজিদের যে ইমাম সাহেব আছে, তার কাছে শুনলাম। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তুমি কি সত্যি কবিতা লেখ?'

'জ্বি স্যার।'

'বেশ। একটা কবিতা শোনাও। কবিতা আমি পছন্দ করি। শোনাও একটা কবিতা।'

আজিজ মাস্টার তাকাল নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে। সে শুকনো গলায় বলল, 'স্যার শোনাতে বলছে শোনান। চেয়ারে বসেন। বসে শোনান। ভয়ের কিছু নাই।'

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'বল, বল, সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। লেটেস্ট কবিতাটি বল।'

আজিজ মাস্টার যন্ত্রের মতো চার লাইন বলে গেল :

'আজি এ নিশিথে তোমারে পড়িছে মনে
হৃদয়ে যাতনা উঠিছে জাগিয়া ক্ষণে ক্ষণে,
তুমি সুন্দর চেয়ে থাকি তাই কল্পলোকের চোখে
ভালবাসা ছাড়া নাই কিছু আর মোর মরুময় বুকে।'

নীল শার্ট সেটি অনুবাদ করে দিল। মেজর সাহেব বললেন, 'এটিই তোমরা লেটেস্ট?'

'জ্বি স্যার।'

'ভালো হয়েছে। বেশ ভালো। তা মেয়েটি কে।'

'জ্বি স্যার?'

'কবিতার মেয়েটি কে? ওর নাম কি?'

'মালা।'

'মেয়েটি এখানেই থাকে?'

আজিজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, 'এইখানেই থাকে।'

'তোমার স্ত্রী নাকি?'

'জ্বি –না স্যার। আমি বিয়ে করি নি।'

'এই মেয়েটিকে বিয়ে করতে চাও?'

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল। বলে কী এই লোক!

'কী, বল। চুপ করে আছ কেন? নাকি মেয়ের বাবা তোমার মতো বুড়োর কাছে বিয়ে দিতে চায় না?'

আজিজ মাস্টার খুকখুক করে কাশতে লাগল। নীল শার্ট তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'স্যারের কথার জবাব দেন। স্যার রেগে যাচ্ছেন।'

মেজর সাহেব কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। তাঁর চোখ দু'টি খুশি–খুশি।

'বল, মেয়েটির বয়স কত?'

'বয়স কম।'

'কত?'

'তের–চোদ্দ।'

'তের–চোদ্দ বছরের মেয়েই তো ভালো। যত কম বয়স তত মজা।'

আজিজ মাস্টার স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী বলছে এসব!

'মেয়েটির সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক আছে?'

'না।'

'মাথা নিচু করে আছ কেন? মাথা তোল।'

আজিজ মাস্টার মাথা তুলল।

'মেয়েটির বুক কেমন আমাকে বল। আমি শুনেছি বাঙালি মেয়েদের বুক খুব সুন্দর, কথাটা কি ঠিক?'

'আমি জানি না।'

'জান না! বল কী! তুমি এখনো কোনো মেয়ের বুক দেখ নি?'

'আমি বিয়ে করি নি।'

'তাতে কী?'

আজিজ মাষ্টারের কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। বমি-বমি ভাব হল। মেজর সাহেব হঠাৎ সুর পাল্টে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটি কার? আই মিন ওর বাবার নাম কি?' আজিজ মাষ্টার জবাব দিল না। মেজর সাহেব অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, 'শুধু-শুধু দেরি করছ, বলে ফেল।' নীল শার্ট বলল, 'কেন শুধু-শুধু রাগাচ্ছেন? বলে দেন না!'

'জয়নাল মিয়ার মেয়ে। উনার বড় মেয়ে।'

'যার বাড়িতে ট্রানজিস্টার আছে?'

আজিজ মাষ্টার বেশ অবাক হল। এই লোকটির স্মৃতিশক্তি বেশ ভালো। মনে রেখেছে।

'তুমি এখন আর আগের মতো স্বতস্ফূর্তভাবে কথা বলছ না। প্রতিটি প্রশ্ন দু' বার করে করতে হচ্ছে। কারণ কি?'

আজিজ মাষ্টার জবাব দিল না।

'তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ! বল, রাগ করেছ?'

'না।'

'এখন তুমি আর স্যার বলছ না। কেন? নিশ্চয়ই তুমি আমার উপর রাগ করেছ।'

'জ্বি-না স্যার।'

মেজর সাহেব অনেকখানি ঝুঁকে এলেন আজিজ মাষ্টারের দিকে। গলার স্বর নিচে নামিয়ে বললেন, 'শোন, ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আজ রাতে সম্ভব হবে না। আজ রাতে আমরা ব্যস্ত। কাল ভোরে। কি, তুমি খুশি তো?'

আজিজ মাষ্টার তাকিয়ে রইল।

'কি, কথা বলছ না যে? বল, শুকরিয়া।'

'শুকরিয়া।'

'আমি কথার খেলাফ করি না। যা বলেছি তা করব। এখন তুমি আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দাও।'

মেজর সাহেব সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। নিজে একটি ধরালেন। তাঁর চোখে এখন আর হাসি ঝিকমিক করছে না।

'তোমাদের এই জঙ্গলা-মাঠে কী আছে?"

'কিছু নাই। জঙ্গল।

'আমরা জানি ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বেশ কিছু জোয়ান এবং কয়েক জন অফিসার এখানে লুকিয়ে আছে।'

আজিজ মাষ্টারের চোখ বড়-বড় হয়ে গেল।

'ওরা আমাদের দু' জন অফিসারকেও নিয়ে গেছে। এক জন হচ্ছে আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার। ফুটবল প্লেয়ার।'

'আমি কিছুই জানি না স্যার।'

'কিছুই জান না?'

'জ্বি—না স্যার।'

'আমি যত দূর জানি, এ-গ্রাম থেকেই তো ওদের খাবার যাচ্ছে।'

'আমি স্যার, কিছুই জানি না।'

'আমি ভাবছিলাম জান।'

'জানি না স্যার।'

মেজর সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। প্রচণ্ড প্রস্রাবের বেগ হয়েছে আজিজ মাস্টারের। সে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'স্যার, আমি যাই?'

মেজর সাহেব চোখ না-খুলেই বললেন, 'সেটা কি ঠিক হবে? আমরা ওদের ধরতে এসেছি। এখন তোমাকে যেতে দিলে খবরটা ওদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। পারে না?'

আজিজ মাস্টার ঢোক গিলল।

'তুমি ঐ ঘরে আজ রাতটা কাটাও। আমরা অপারেশন শুরু করব বিকেলের দিকে। আরেকটি বড় কোম্পানি আসবে আমাকে সাহায্য করতে। ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

আজিজ মাস্টারের হাঁপানির টান উঠে গেল। টেনে-টেনে শ্বাস নিতে লাগল। মেজর সাহেব হালকা গলায় বললেন, 'তোমাকে অনেক গোপন খবর দিয়ে দিলাম। তবে অসুবিধা নেই, তুমি বন্ধু-মানুষ। যাও, ঐ ঘরে চলে যাও।'

'স্যার, আমি কিছুই জানি না।'

'জান না—সে তো আগেই বলেছ। সবাই কি আর সব কিছু জানে? জানে না। যাও, ঐ ঘরে গিয়ে বসে থাক।'

রোদ থেকে এসেছে বলেই কি না কে জানে, এত পরিচিত ঘরও আজিজ মাস্টারের কাছে অচেনা লাগতে লাগল। অথচ এটা টীচার্স রুম। আজিজ মাস্টার রোজ এখানে বসে।

'মাস্টার সাব।'

'কে?'

আজিজ মাস্টার অবাক হয়ে দেখল, একটা চেয়ারে ইমাম সাহেব জড়সড় হয়ে বসে আছেন। ইমাম সাহেবের নাক-মুখ ফুলে গেছে। নিচের ঠোঁটটি কেটে গেছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে রক্তের ছোপ। কাটা ঠোঁট দিয়ে হলুদ রঙের রস বেরুচ্ছে। আজিজ মাস্টার দীর্ঘ সময় তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল এবং নিজের অজান্তেই এক সময় তার প্রস্রাব হয়ে গেল।

ইমাম সাহেব তাকিয়ে দেখলেন। মেঝেতে প্রস্রাব গড়াচ্ছে। তাঁর কোনো ভাবান্তর হল না।

৭

দিনের বেলা মীর আলির কাজ হচ্ছে পরীবানুকে কোলে নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা। পরীবানুর বয়স তিন। দাদাকে সে খুবই পছন্দ করে। মীর আলিও জগতের অনেক জটিল বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। মীর আলির কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে সে পরীবানুর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়।

আজ ভোরবেলাও সে নাতনীকে কোলে নিয়ে মুড়ি খেতে বসেছিল। দাঁত না-থাকায় মুড়ি চিবোতে পারে না। একগাল মুড়ি নিয়ে তাকে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়। ঘরে আম আছে। একটা পাকা আমের রস মুড়ির বাটিতে ঢেলে দিলেই সমস্যার সমাধান হয়। অনুফা সেটা করবে না। বদি বাড়িতে না-থাকলে সে তার শ্বশুরের খাওয়াদাওয়ার দিকে তেমন নজর দেয় না।

আজ তার চা খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঘরে চায়ের পাতা আছে, গুড় আছে। বদি এনে রেখেছে। তার বাবার জন্যেই এনেছে। তিনি নিজের কানে শুনেছেন—বদি বলছে, 'বাজানরে মাঝেমধ্যে দিও। বুড়া মানুষ। চা-য় কাশির আরাম হয়।'

মীর আলি প্রতিদিন ভোরেই বেশ সাড়ম্বরে খানিকক্ষণ কাশে, যাতে অনুফার চায়ের কথাটা মনে পড়ে। বেশির ভাগ দিনই তার মনে পড়ে না। আজও হয়তো পড়বে না। তবু সে কাশতে লাগল। কাশতে-কাশতেই পরীবানুকে বলল, 'চা হইল সর্দিকাশের বড়ো অষুধ। বুঝছস পরী?'

পরী উত্তর দিল না।

'বড় জামবাটির এক বাটি চা যদি সকালে খায় কেউ, তা হইলে সর্দিকাশি, বাত সব যায়। চা'টা খুব বড় অষুধ।'

মীর আলির জন্যে আজ দিনটি সম্ভবত খুব শুভ। কারণ অনুফা তাকে এক বাটি চা এনে দিল। সেই চা'য়ে তেজপাতা দেওয়ায় বেশ সুন্দর একটা গন্ধ। অভিভূত হয়ে পড়ল মীর আলি।

'মিষ্টি হইছে কি না দেখেন।'

'হইছে গো বেটি, হইছে। জবর বালা হইছে।'

অনুফাকে দু'-একটা সুন্দর-সুন্দর কথা বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কী বললে সে খুশি হয় তা মীর আলির জানা নেই।

'মুড়ি চায়ের মইধ্যে ভিজাইয়া চামুচ দিয়া খান। চামুচ দিতাছি।'

মীর আলি অনুফার প্রতি বড় মমতা বোধ করল। সংসারের আয়-উন্নতি যা হচ্ছে এই মেয়েটির কারণেই হচ্ছে। ঘরে এখন চামচ আছে। নতুন সাইকেল আছে। গত বৎসর বদি তাকে লেপ বানিয়ে দিয়েছে। বলতে গেলে গত শীত কোন দিকে গিয়েছে বুঝতেই পারা যায় নি। অথচ বদিকে বিয়ে করানোর আগে কী হাল ছিল সংসারের! সব ভাগ্য। একেক জনের একেক রকম ভাগ্য। অনুফা এ-সংসারে ভাগ্য নিয়ে এসেছে। মীর আলি ভাবতে চেষ্টা করল, অনুফা এ-বাড়িতে আসার পর তারা কি কখনো এক বেলা না-খেয়ে থেকেছে? না। নীলগঞ্জের এ-রকম ভাগ্য কয় জনের আছে? অথচ কত ঝামেলা বদির বিয়েতে। শেষ মুহূর্তে বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অবস্থা। বদির মামা বলল, 'এই মেয়ের মা নাই। জামাইয়ের কোনো আদর হইত না।' কথা খুবই সত্য।

কিন্তু বিয়ের কথা ঠিকঠাক হবার পর বিয়ে ভেঙে দেওয়াটা ঠিক না। মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে সে ছেলে নিয়ে গেল। কী ঝড় বিয়ের রাত্রে! লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দুপুররাতে ছেলে-বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখল ঝড়ে গ্রামে কারোর কোনো ক্ষতি হয় নি, শুধু তার ঘরটি পড়ে গেছে। কী অলক্ষণ!

'দাদা, চা দেও।'

'পুলাপান মাইনষের চা খাওন নাই।'

'চা দেও, দাদা।'

মীর আলি হাঁক দিল, 'বৌমা, আরেকটা বাটি দেও।' এই সময় এক ঝাঁক গুলি হল। হালকা মেশিনগানের কানে তালা-ধরানো ক্যাটক্যাট শব্দ। পরীবানু আকাশ ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। মীর আলি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চায়ের বাটি উল্টে ফেলল পরীবানুর পায়ে।

নীলগঞ্জ গ্রামে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় একটা সৈন্যদল এসে ঢুকল। তারা ঢুকল মার্চ করে। গর্বিত ভঙ্গিতে। তাদের সঙ্গে আছে চল্লিশ জন রাজাকারের একটি দল। তালে-তালে পা ফেলবার একটা প্রাণান্ত চেষ্টা করছে তারা। দলটি অনেক দূর থেকে আসছে। এদের চোখেমুখে ক্লান্তি। হয়তো সারা রাত ধরেই হাঁটছে, কোথাও বিশ্রাম করে নি।

বদিউজ্জামান হনহন করে হাঁটছিল। হাঁটা না-বলে একে দৌড়ানো বলাই ঠিক হবে। কয়েক দিন বৃষ্টি না-হওয়ায় রাস্তাঘাট শুকনো। দ্রুত হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তার একমাত্র চেষ্টা কত তাড়াতাড়ি মধুবন বাজারে গিয়ে পৌছানো যায়। মাঝামাঝি পথে সে মত বদলাল—ফিরে চলল নীলগঞ্জের দিকে। যা হবার হোক, এই সময় বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া ঠিক না। জঙ্গলা-মাঠের কাছাকাছি আসতেই সে দ্বিতীয় মিলিটারি দলটিকে দেখতে পেল। ওরা আসছে উত্তর দিক থেকে। বদিউজ্জামান উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল জঙ্গলা-মাঠের দিকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল নিচু একটা গর্তে। সেখানে এককোমর পানি। তাকে কেউ সম্ভবত দেখতে পায় নি। বদিউজ্জামান এককোমর পানিতে ঘন্টাখানেক বসে রইল। মিলিটারিদের এই সময়ের মধ্যে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু এরা যাচ্ছে না কেন? কিছুক্ষণ পর খুব কাছেই ওদের কথাবার্তা শোনা যেতে লাগল। এর মানে কী?

বদিউজ্জামান মাথা উঁচু করে দেখতে চেষ্টা করল। চোখের ভুল কি না কে জানে, তার মনে হল মিলিটারিরা জঙ্গলা-মাঠ ঘিরে বসে আছে। বদিউজ্জামান গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে একটা মোরতা ঝোপের আড়ালে মাথা ঢেকে রাখল। মাথার উপর ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। কিন্তু পানি বেশ ঠাণ্ডা। বদিউজ্জামানের শীত-শীত করতে লাগল। কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? গা কুটকুট করছে। সবুজ রঙের একটা গিরগিটি চোখ বড়-বড় করে তাকে দেখছে। বদিউজ্জামান হাত ইশারা করে তাকে সরে যেতে বলল। রোদ বাড়ছে। ক্রমেই বাড়ছে। পচা গন্ধ আসছে পানি থেকে। পাট পচানোর গন্ধের মতো গন্ধ। গিরগিটিটা পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। বদিউজ্জামান মৃদু স্বরে বলল—যা, হোস্। আর তখনি নীলগঞ্জের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলির শব্দ আসতে লাগল। কী ব্যাপার?

জয়নাল মিয়া তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সময় ছাতিম গাছের নিচে অপেক্ষা করল—আজিজ মাস্টার ফিরে এল না। কতক্ষণ এভাবে বসে থাকা যায়? রাসমোহন কয়েক বার বাঁশঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে। আজিজ মাস্টার চেয়ারে বসে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে সে এসে বলল—আজিজ মাস্টারকে আর দেখা যাচ্ছে না। এর মানেটা কী? জয়নাল মিয়া বলল, 'বিষয়ডা কি, রাসমোহন?' রাসমোহন শুকনো মুখে বসে রইল।

'মাইরা ফেলছে নাকি?'

'মারলে গুলির শব্দ হইত। গুলি তো হয় নাই।'

'তাও ঠিক।'

জয়নাল মিয়া মতি মিয়ার কাছ থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরাল। তার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। আর তখন মতি মিয়ার পাগল শালা নিজামকে আসতে দেখা গেল। তার মুখ হাসি-হাসি। পাগলামির অন্য কোনো লক্ষণ নেই। মতি মিয়া ধমকে উঠল, 'কই গেছিলা?'

নিজামের হাসি আকর্ণ বিস্তৃত হল। সে হাত নেড়ে-নেড়ে বলল, 'ইস্কুলঘরের পিছনের দিক দিয়া আইতেছিলাম, একটা মজার জিনিস দেখলাম, দুলাভাই।'

'কী দেখলা?'

'দেখলাম দুইটা মিলিটারি হাগতে বসছে। লজ্জাশরম নাই। হাগে আর কথা কয়। আবার হাগে, আবার কথা কয়।'

নিজাম হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ল। ঠিক তখন গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে মিলিটারি ও রাজাকারের দ্বিতীয় দলটি গ্রামে উঠে এল। জয়নাল মিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াল দক্ষিণ দিকে। বাকিরাও তাকে অনুসরণ করল। নিজাম শুধু মুখটি হাসি-হাসি করে দাঁড়িয়ে রইল। সমস্ত ব্যাপারটিতে সে বড় মজা পাচ্ছে।

৮

ইমাম সাহেব এক সময় বললেন, 'দোয়া ইউনুসটা দমে-দমে পড়েন মাস্টার সাব।' আজিজ মাস্টার তাকাল তার দিকে, তাকানোর ভঙ্গিতে মনে হয় সে কিছুই বুঝতে পারছে না। গত তিন ঘন্টা যাবৎ এই দু'টি মানুষ একসঙ্গে আছে। এই তিন ঘন্টায় তাদের কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয় নি। আজিজ মাস্টার তার পায়জামা ভিজিয়ে ফেলার পর থেকে কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। কোনো কিছুতে মন দিতে পারছে না।

'হযরত ইউনুস আলায়হেস-সালাম মাছের পেটে এই দোয়া পড়তেন। এর মর্তবাই অন্য। দোয়াটা জানেন?'

আজিজ মাস্টার মাথা নাড়ল। সে জানে। কিন্তু ইমাম সাহেবের মনে হল সে কিছু পড়ছে-টড়ছে না। বসে আছে নির্বোধের মতো।

'মাস্টার সাব।'

'জ্বি।'

'আমাদের সামনে খুব বড় বিপদ।'

'কেন?'

'বুঝতে পারতেছেন না?'

'না।'

'এরা কি জন্যে আসছে সেটা বলেছে?'

'হুঁ।'

'তবু বুঝতে পারতেছেন না?'

'না।'

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। আজিজ মাস্টার খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। এখান থেকে সৈন্যদলের একটা অংশ দেখা যায়। কয়েক জনকে দেখা যাচ্ছে কাগজের একটা বল বানিয়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারছে। এবং ক্রমাগত হাসছে। কাগজের একটা বল ছুঁড়ে মারার মধ্যে এত আনন্দের কী আছে কে জানে?

স্কুলঘরটি টিনের। রোদে টিন তেতে উঠেছে। ঘরের ভেতর অসহ্য গরম। আজিজ মাস্টারের পানির তৃষ্ণা পেয়ে গেল। শুধু তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও বোধ হচ্ছে। বেলা অনেক হয়েছে। ক্ষুধা হওয়ারই কথা। অন্য সময় এত দেরি হলে মালা খোঁজ নিত, 'মামা, ভাত বাড়ছে। আসেন।' বলেই সে চলে যেত না। দরজা ধরে এঁকেবেঁকে দাঁড়াত। যেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

গতবার ময়মনসিংহ থেকে মালার জন্যে একটা আয়না কিনেছিল আজিজ মাস্টার। খুব বাহারি জিনিস। দু'টা আয়না পাশাপাশি। একটি সাধারণ আয়না, অন্যটি একটু অন্য রকম। সেটায় মুখ অনেক বড়ো দেখা যায়।

আয়নাটা দেওয়া ঠিক হবে কি না তা নিয়ে আজিজ মাস্টার প্রায় এক সপ্তাহ ভাবল। কেউ কিছু মনে করে বসতে পারে। তাহলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

কেউ কিছু মনে করল না। মালা অভিভূত হয়ে পড়ল। একটা আয়নায় মুখ বড় দেখায় কেন—এই প্রশ্ন বেশ কয়েক বার করা হল। এমনকি মালার মা একদিন পর্দার আড়াল থেকে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'মুখ বড় দেখালে কী লাভ?' আজিজ মাস্টার লাজুক স্বরে বলেছিল, 'সাজগোজের সুবিধা হয়, ভাবী।'

'কী সুবিধা?'

কি সুবিধা সেটি আর ব্যাখ্যা করতে পারে নি। কারণ এটা আজিজ মাস্টারেরও জানা ছিল না।

ইমাম সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

'মাস্টার সাব।'

'বলেন।'

'জোহর নামাজের ওয়াক্ত হইছে না?'

'জানি না।'

'নামাজটা পড়া দরকার। বের হয়ে ওদের কাছে পানি চাব? ওজু নাই আমার।'

'দেখেন আপনি চিন্তা করে।'

'আপনি তো আর নামাজ পড়তে পারবেন না, শরীর নাপাক। গোসল লাগবে। পেশাব করে দিয়েছেন তো!'

আজিজ মাষ্টার জবাব দিল না। ইজি চেয়ারটিতে চোখ বন্ধ করে হেলান দিয়ে পড়ে রইল। ইজি চেয়ারটি নীলু সেনের। শুয়ে থাকতে বড় আরাম।

'মাষ্টার সাব। পানি চাইব নাকি, বলেন?'

'আপনার ইচ্ছা হলে চান।'

'এর মধ্যে তো দোষের কিছু নেই। এরাও মুসলমান।

'হুঁ।'

'নামাজের পানি চাইলে এরা খুশিই হবে। পাক্কা মুসলমানদের এরা খুব পেয়ার করে। এরাও তো সাচ্চা মুসলমান।'

'যান না। গিয়ে চান।'

'ভয় লাগে।'

'ভয়ের কী আছে?'

ইমাম সাহেব নড়েন না। জড়সড় হয়ে চেয়ারেই বসে থাকেন। চোখ বন্ধ করে ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে-থাকতে আজিজ মাষ্টারের ঝিমুনি আসে। ঝিমুতে-ঝিমুতে এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে। এর মধ্যেই ছাড়া-ছাড়া বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পারে—এগুলি স্বপ্ন। তবু তার ভালোই লাগে।

ইমাম সাহেব বিরক্ত মুখে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। এ কেমন মানুষ—ঘুমিয়ে পড়েছে! তিনি মৃদু স্বরে ডাকেন, 'এই যে মাষ্টার সাব। এই!' আজিজ মাষ্টার নড়েচড়ে—কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না।

নীলু সেন গত রাতে এক পলকের জন্যেও ঘুমুতে পারেন নি। দোতলার যে-ঘরটিতে তাঁর বিছানা, সে-ঘরের বারান্দায় গড়াগড়ি করেছেন। নীলু সেনের বোন-পো বলাই চোখ বড়-বড় করে মামার অবস্থা দেখেছে। রাত দুটোর দিকে বলাই ঠিক করল, মামার জন্যে ডাক্তার আনতে সরাইল বাজারে যাবে। পথঘাট এখন শুকনো। বদিউজ্জামানের সাইকেল নিয়ে যাওয়া যাবে। নীলু সেন হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'এতক্ষণ বাঁচব নারে বলাই, এতক্ষণ বাঁচব না।' বলাইয়েরও তাই ধারণা হল। এত কষ্ট সহ্য করে কেউ দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকতে পারে না। থাকা উচিতও নয়।

'ব্যথাটা কোথায়?'

'তলপেটে।'

বলাই দ্বিতীয় প্রশ্নের সময় পেল না। নীলু সেনের মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুতে লাগল। সময় শেষ হয়েছে বোধহয়। এত বড় বাড়িতে দু'টিমাত্র প্রাণী। বলাইয়ের ভয় করতে লাগল। কী সর্বনাশ! এ কী বিপদ!

'মামা, গ্রামের দুই-এক জন মানুষরে ডাক দিয়া আনি?'

'তুই নড়িস না। আমার সময় শেষ।'

বলাই মামার হাত ধরে বসে রইল। তার কাছে মনে হল মামার গা- হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। বলাই ঘামতে লাগল।

কিন্তু শেষরাত্রে হঠাৎ ব্যথা কমে গেল। নীলু সেন শান্ত স্বরে বললেন, 'ব্যথা নাই। বলাই, ঠাণ্ডা পানি দে এক গ্লাস।'

বলাই পানি এনে দেখে মামা মেঝেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। বড় মায়া লাগে দেখে।

গ্রামে মিলিটারি আসার এত বড় একটা খবরেও বলাই তাঁর ঘুম ভাঙাল না। আহা বেচারা, ঘুমাক।

নীলু সেনের ঘুম ভাঙাল মিলিটারিরা। ডাকাডাকি হৈচৈ শুনে নীলু সেন দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বের করলো। কী ব্যাপার? নীল শার্ট পরা একটি লোক বলল, 'আপনার নাম কি নীলু? নীলু সেন?'

'জ্বে আজ্ঞে।'

'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'

'বলাই। আমার বোন-পো বলাই। আপনারা কে?'

'বলাইকে নিয়ে নিচে নেমে আসেন।'

নীলু সেন বলাইকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। গায়ে একটা পাতলা সুজনি চড়িয়ে নিচে নেমে এলেন। ভারি দরজা খুলতে সময় লাগল। বাইরে থেকে অসহিষ্ণু কণ্ঠে কে যেন বলল, 'এত সময় লাগছে কেন?'

নীলু সেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁর ঘুমের ঘোরও বোধহয় ভালো-মতো কাটে নি। তিনি দরজা খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'আদাব।'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই চার-পাঁচটি গুলির শব্দ হল। নীলু সেন কাত হয়ে পড়ে গেলেন দরজার পাশে। কোনো চিৎকার না—নিঃশব্দ মৃত্যু। নীল শার্ট পরা লোকটি ডাকল, 'বলাই! বলাই!'

৯

বদিউজ্জামান মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। তার মনে হল, পায়ে আর কোনো বোধশক্তি নেই। মাথা কেমন যেন করছে। গিরগিটিটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর চোখ দু'টি মানুষের মতো মনে হয় হাসছে। বুড়ো মানুষের মতো মাথা ঝুঁকিয়ে-ঝুঁকিয়ে হাসা। সে হাত ইশারা করে গিরগিটিটাকে বিদেয় করতে চাইল। কিন্তু সে যাচ্ছে না, তাকিয়ে আছে।

আচ্ছা—মিলিটারিদের সম্পর্কে যে-সব গল্প শোনা যায় সেগুলি সত্যি? শুধু-শুধু এরা মানুষ মারবে কেন? এরা নাকি নতুন কোনো জায়গায় গেলেই প্রথম ধাক্কায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ মেরে ফেলে ভয় দেখাবার জন্যে। এটা একটা কথা হল? সব গুজব। এরাও তো আল্লাহ্‌র বান্দা। মিলিটারিও মানুষ, রক্ত একটু গরম—এই আর কি। এটা তো দোষের কিছু না। পোশাকটাই এ-রকম, গায়ে দিলে রক্ত গরম হয়ে যায়।

বদিউজ্জামান খুকখুক করে দু' বার কাশল। নিজের কাশির শব্দে নিজেই চমকে উঠল। কেমন বেকুবের মতো কাণ্ড করছে! নির্জন জায়গা। অল্প শব্দ হলেই অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আবার কাশি আসছে। বদিউজ্জামান কাশি সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ঘড়ঘড় একটা শব্দ বের করল। গিরগিটিটা ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছে। না, যাচ্ছে না, আবার দাঁড়িয়ে পড়েছে। পানি খেতে এসেছে বোধহয়। তাকে দেখে পানি খাবার সাহস হচ্ছে না, আবার তৃষ্ণা নিয়ে চলেও যেতে পারছে না।

বদির আবার তৃষ্ণা বোধ হল। সে মাথা নিচু করে কয়েক ঢোক পানি খেল।

১০

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'আপনারা দু' জন আসেন আমার সঙ্গে।' আজিজ মাষ্টার তাকাল ইমাম সাহেবের দিকে। ইমাম সাহেব ভীত স্বরে বললেন, 'কোথায়?' নীল শার্ট পরা লোকটির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। তাকে কোনো প্রশ্ন দ্বিতীয় বার করার সাহস হয় না। তবু ইমাম সাহেব দ্বিতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়?'

'বিলের কাছে।'

'কেন?'

'মেজর সাহেব নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কী জন্যে?'

'এত কিছু জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই। আপনারা উঠেন। মেজর সাহেব অপেক্ষা করছেন।'

'বড় ভয় লাগতেছে ভাই।'

'ভয়ের কিছু নাই—আসেন।'

আজিজ মাষ্টার একটি কথাও বলল না। নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। সবার শেষে বেরুলেন ইমাম সাহেব। তিনি খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন।

স্কুলঘরের বারান্দায় কেউ নেই। ধু-ধু করছে চারদিক। বসে-থাকা সেপাইরা কখন গিয়েছে, কোথায় গিয়েছে, কে জানে। ঘরের ভেতরে বসে কিছুই বোঝা যায় নি। হয়তো কোনো পাহারাটাহারা ছিল না। ইচ্ছা করলেই পালিয়ে যাওয়া যেত। ইমাম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'এরা সব কোথায় গেল?'

নীল শার্ট পরা লোকটি বলল, 'বেশি কথা বলবেন না। আপনারা মৌলবী-মুসুল্লিরা বেশি কথা বলেন আর ঝামেলার সৃষ্টি করেন। কম কথা বলবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

ইউনিয়ন বোর্ডের সড়ক পর্যন্ত তারা এগোল নিঃশব্দে। জুম্মাঘরের পাশে আট-ন জন সেপাইয়ের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ইমাম সাহেবের ঘন-ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। তিনি নীল শার্ট পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, 'ভাই, আপনার নাম কি?'

'রফিক।'

'রফিক সাহেব, আমার জোহরের নামাজ কাজা হয়ে গেছে। পানির অভাবে অজু করতে পারি নাই।'

রফিক তার কোনো জবাব দিল না। আগে-আগে হাঁটতে লাগল। কোথাও কোনো মানুষজন নেই। গ্রামের সবাই কি ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে আছে নাকি? ইমাম সাহেব বললেন, 'ভাই, আপনার দেশ কোথায়? বাড়ি কোন জিলায়?'

'বাড়ি দিয়ে কী করবেন?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমার দেশ কুমিল্লা। নবীনগর।'

'ভালো।'

'সামনের মাসে ইনশাল্লাহ্‌ দেশে যাব। বহুত দিন যাই না।'

রফিক কিছুই বলল না। সে হাঁটছে মাথা নিচু করে। এমনভাবে হাঁটছে যেন পথঘাট খুব ভালো চেনা। কিন্তু এ-লোকটি এই গ্রামে আগে কখনো আসে নি। আজিজ মাস্টার বলল, 'মেজর সাহেব কেন ডেকেছেন আপনি জানেন?'

'জানি।'

'জানলে আমাদের বলেন।'

রফিক নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'একটি অপরাধীর বিচার হবে। ওর নাম, মনা। সে খুন করেছে। সেই খুন নিয়ে কোনো থানা-পুলিশ হয় নি। এক বুড়ি নালিশ করেছে মেজর সাহেবের কাছে। ঐ বুড়ির নাম চিত্রা বুড়ি।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'চিত্রা বুড়ি। খুব বজ্জাত। মসজিদের একটা বদনা চুরি করেছে।'

'বদনা চুরি করুক আর না-করুক মেজর সাহেব তার কথা শুনে খুব রাগ করেছেন। মনাকে ধরা হয়েছে। কঠিন শাস্তি হবে।'

আজিজ মাস্টার ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কী শাস্তি?'

'মিলিটারিদের তো আর জেল-হাজত নাই যে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। ওদের শাস্তি একটাই। ছোট অপরাধের জন্যে যে-শাস্তি, বড়ো অপরাধের জন্যেও সেই শাস্তি।'

'কী সেটা?'

'বুঝতেই তো পারছেন, আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

ইমাম সাহেব শুকনো গলায় বললেন, 'আমরা গিয়ে কী করব?'

'আপনারা শাস্তি দেখবেন।'

'শাস্তি দেখব!'

'হ্যাঁ। এর দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'মেজর সাহেবের ধারণা, এটা দেখার পর আপনারা তাঁর কথা শুনবেন। কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে সোজাসুজি জবাব দেবেন।'

'ও।'

'শুনেন ইমাম সাহেব, আপনি কথা বেশি বলেন। কথা বেশি বলে এক বার মার খেয়েছেন। কথা খুব কম বলবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'নিজের থেকে কোনো কথা বলবেন না। এখন সময় খারাপ।'

'জ্বি, তা ঠিক।'

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন।

মীর আলি বাড়ির উঠোনে বসে ছিল। আজ বাড়িতে রান্না হয় নি। খিদের যন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে পড়ল। এই বয়সে খিদে সহ্য হয় না। অনুফাকে কয়েক বার ভাতের কথা বলাও হয়েছে। কিন্তু অনুফা কিছু করছে না। সে ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। ভাত রাঁধায় তার মন নেই। ভয় মীর আলিরও লাগছে। কিন্তু খিদের কষ্ট বড় কষ্ট।

আজিজ মাস্টাররা তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে এক থালা মুড়ি নিয়ে বসে ছিল। এই বয়সে মুড়ি চিবোতে কষ্ট হয়, তবু চিবোতে হয়। যা ভাবসাব তাতে মনে হচ্ছে আজ আর রান্না হবে না। পায়ের শব্দে মীর আলি চমকে উঠে বলল, 'কেডা যায়?'

'আমি আজিজ। আজিজ মাস্টার।'

'তোমার সঙ্গে কেডা যায়?'

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

'কথা কও না যে! ও মাস্টার, মাস্টার।'

রফিক বলল, 'দাঁড়াবেন না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ও মাস্টার, কে কথা কয়?'

রফিক শীতল স্বরে বলল, 'আমার নাম রফিক। চাচা মিয়া, আপনি ঘরের ভেতরে গিয়ে বসেন।'

'মাস্টার, এই লোকটা কে? মিলিটারি?'

'না। আমি মিলিটারি না।'

'আপনার বাড়ি কোন গ্রাম?

রফিক তার জবাব দিল না। হাঁটতে শুরু করল। ইমাম সাহেব তাল মিলিয়ে হাঁটতে পারছেন না। ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছেন। তার জন্যে দু' জনকেই মাঝে-মাঝে দাঁড়াতে হচ্ছে। রফিক বলল, 'হাঁটতে কষ্ট হলে আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'জ্বি-না। কোনো কষ্ট নাই।'

'লজ্জার কিছু নাই। আমার হাত ধরে হাঁটেন।'

'শুকরিয়া। ভাই, আপনার বয়স কত?

'আমার বয়স দিয়ে কী করবেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম।'

'আপনাকে তো বলেছি বিনা প্রয়োজনে কথা বলবেন না।'

'জ্বি, আচ্ছা।'

'আমার বয়স তিরিশ।'

রফিককে দেখে বয়স আরো বেশি মনে হয়। রোগা এবং লম্বা। ছোট-ছোট চোখ। কথা বললে চোখ আরো ছোট হয়ে যায়। মনে হয় লোকটি যেন চোখ বন্ধ করে কথা বলছে।

ইমাম সাহেব দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। লাইলাহা ইল্লা আন্তা সোবাহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জুয়ালেমিন।

মনা কৈবর্ত তার এগার বছরের ভাইকে নিয়ে তেঁতুল গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। মনার শরীর বিশাল—প্রায় দৈত্যের মতো। তার ভাইটি অসম্ভব রোগা। সে মনার লুঙ্গির এক প্রান্ত শক্ত করে ধরে আছে। তাকাচ্ছে সবার মুখের দিকে। বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠছে। মনাকে খুব একটা বিচলিত মনে হচ্ছে না।

মেজর সাহেব প্রায় দশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। তাঁর সঙ্গে এক জন নন-কমিশন্ড অফিসার। এরা দু' জন নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। মেজর

সাহেব সম্ভবত কোনো রসিকতা করলেন। দু' জনেই উঁচু গলায় হাসতে শুরু করল। মনার ভাইটি চোখ বড়–বড় করে তাকাল তাদের দিকে। বিলের পারের উঁচু জায়গায় এক দল রাজাকার দাঁড়িয়ে। খুব কাছেই মিলিটারি আছে বলেই হয়তো তারা বুক ফুলিয়ে আছে। অহঙ্কারী গর্বিত ভঙ্গি। এদের মধ্যে শুধু দু' জনের পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। বাকি কারোর পায়ে কিছু নেই। এরা নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা বলছে। তবে এদের মুখ শুকনো, ভয়–পাওয়া চোখ।

মেজর সাহেব এগিয়ে এলেন মনার দিকে। মনার ছোট ভাইটি শক্ত হয়ে গেল। মনার সঙ্গে মেজর সাহেবের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল। কথাবার্তা হল রফিকের মাধ্যমে। আজিজ মাস্টার ও ইমাম সাহেবকে সরিয়ে দেওয়া হল। তারা বসে রইল বিলের পাড়ে। প্রশ্নোত্তর শুরু হল।

'তুমি একটি খুন করেছ?'

মনা জবাব দিল না। মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'চুপ করে থাকবে না। স্পষ্ট জবাব দাও। বল হ্যাঁ কিংবা না।'

'হ্যাঁ।'

'গুড। স্পষ্ট জবাব আমি পছন্দ করি। এখন বল—কেন করেছ? বিনা কারণে তো কেউ মানুষ মারে না।'

'হে আমার পরিবারের সঙ্গে খারাপ কাম করছে।'

'তাই নাকি?'

'জ্বে আজ্ঞে।'

'উত্তেজিত হবার মতোই একটি ব্যাপার। তোমার স্ত্রীকে কি শাস্তি দিয়েছ?'

মনা মাটির দিকে তাকিয়ে রইল। জবাব দিল না। প্রশ্নের ধারা সে বুঝতে পারছে না।

'বল, বল। কুইক। সময় বেশি নেই আমার হাতে।'

মনা ঘামতে শুরু করেছে।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি কোনো শাস্তি দাও নি।'

'জ্বি–না।'

'সে নিশ্চয়ই খুব রূপবতী?'

মনা চোখ তুলে তাকাল। কিছুই বলল না।

'বল। চট করে বল। সে কি রূপবতী?'

'জ্বি।'

'তাহলে অবশ্যি শাস্তি না–দিয়ে ভালোই করেছ। একটি সুন্দরী নারীকে শাস্তি দেয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তোমার স্ত্রীর নাম কি?'

মনার চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল। মেজর সাহেবের কথাবার্তা কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

'বল, তোমার স্ত্রীর নাম বল।'

মনা কিছুই বলল না। রফিক বলল, 'গ্রামের মানুষরা অপরিচিত মানুষের কাছে স্ত্রীর নাম বলে না।'

'কেন বলে না?'

'আমি জানি না স্যার।'

'তুমি তো অনেক কিছুই জান, এটা জান না?'

'আমি অনেক জিনিস জানি না।'

মেজর সাহেব মনার দিকে আরো কয়েক পা এগোলেন। আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'এই ছেলেটি কী হয় তোমার?'

'এ আমার ছোট ভাই।'

'ওর নাম কি?'

'বিরু।'

মেজর সাহেব তাকালেন বিরুর দিকে। বিরু কুঁকড়ে গেল। মেজর সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, 'বিরু, তুমি লুঙ্গি ধরে টানাটানি করছ কেন? লুঙ্গি ছেড়ে দাও।' বিরু লুঙ্গি ছেড়ে দিল না। আরো ঘেঁষে গেল ভাইয়ের দিকে। তার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। শিশুরা অনেক কিছু আগেই বুঝতে পারে। সেও হয়তো পারছে।

'মনা।'

'জ্বি।'

'তুমি বড় একটা অন্যায় করেছ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার শাস্তি হবে। তোমার কী বলার আছে?'

মনা তাকিয়ে রইল। তার চোখে পলক পড়ছে না। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। অস্থির ভঙ্গিতে দৃঢ় স্বরে বললেন, 'এই দু' জনকে পানিতে দাঁড় করিয়ে দাও।' রফিক ইংরেজিতে বলল, 'এই বাচ্চাটিকেও?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার, এর কি কোনো প্রয়োজন আছে?'

'প্রয়োজন আছে। এর প্রয়োজন আছে। আমি নিষ্ঠুরতার একটা নমুনা দেখাতে চাই।'

'স্যার, তার কোনো প্রয়োজন নেই।'

'প্রয়োজন আছে। আজ এই ঘটনাটি ঘটাবার পর মিলিটারির নামে শুনলে ওরা কাপড় নষ্ট করে দেবে। গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভপাত হয়ে যাবে।'

'তাতে কী লাভ স্যার?'

'লাভ-লোকসান আমার দেখার কথা, তোমার না। আমার সঙ্গে তর্ক করবে না।'

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'এ-সব কথা পরবর্তী সময়ে কেউ মনে রাখবে না। অত্যাচারী রাজারা ইতিহাসে বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে সম্মানিত হন। আলেকজান্ডারের নৃশংসতার কথা কি কেউ জানে? সবাই জানে—আলেকজান্ডার দি গ্রেট।'

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব সহজ সুরে বললেন, 'যা করতে বলা হয়েছে কর। আর শোন, ঐ ইমাম এবং ঐ মাস্টার—ওদের দু' জনকে খুব কাছাকাছি কোথাও বসিয়ে দাও। আমি চাই যাতে ওরা খুব ভালোভাবে দৃশ্যটা দেখে।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'বাই দা ওয়ে, আমি দেখলাম ঐ ইমাম তোমার হাত ধরে-ধরে আসছে। কী ব্যাপার?'

'হাঁটতে পারছিল না।'

'ঠিকই পারবে। দৃশ্যটি তাদের দেখতে দাও, তারপর ওদের হাঁটতে বললে হাঁটবে, দৌড়াতে বললে দৌড়াবে। লাফাতে বললে লাফাবে। ঠিক নয় কি?'

'হয়তো ঠিক।'

'হয়তো বলছ কেন? তোমার মনে সন্দেহ আছে?'

'জ্বি–না স্যার।'

'গুড। সন্দেহ থাকা উচিত নয়। রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেরুব। গ্রামটি ভালোমতো ঘুরে দেখতে চাই।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'মনে হয় দেখার মতো ইন্টারেস্টিং অনেক কিছুই আছে এ–গ্রামে।'

'কিছুই নেই স্যার। এটা একটা দরিদ্র গ্রাম।'

রাজাকাররা মনা আর তার ভাইটিকে ঠেলে পানিতে নামিয়ে দিল। বিরু তার ভাইয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। সে কাঁপছে থরথর করে। মনা এক হাতে তার ভাইকে ধরে আছে।

রাইফেল তাক করা মাত্র বিরু চিৎকার করতে লাগল, 'দাদা, বড় ভয় লাগে। ও দাদা, ভয় লাগে।' মনা মৃদু স্বরে বলল, 'ভয় নাই। আমারে শক্ত কইরা ধর্‌।' বিরু প্রাণপণ শক্তিতে ভাইকে আঁকড়ে ধরল।

ইমাম সাহেব গুলি হবার সময়টাতে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এবং তার পরপরই মুখভর্তি করে বমি করলেন। আজিজ মাস্টার সমস্ত ব্যাপারটি চোখের সামনে ঘটতে দেখল। এক পলকের জন্যেও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল না।

১১

আলো মরে আসছে।

আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। মেজর সাহেব আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি রফিক, বৃষ্টি হবে?'

'হতে পারে। এটা ঝড়বৃষ্টির সময়।'

'তোমার দেশের এই ঝড়বৃষ্টিটা ভালোই লাগে।'

রফিক মৃদু স্বরে বলল, 'তোমার দেশ বললেন কেন?' মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। যেন গ্রামে কোনো জনমানুষ নেই। মেজর সাহেব হাল্কা গলায় বললেন, 'মানুষকে ভয় পাইয়ে দেবার একটা আলাদা আনন্দ আছে। আছে না?'

রফিক জবাব দিল না। মেজর সাহেব বললেন, 'মানুষের ইনসটিংটের মধ্যে এটা আছে। অন্যকে পায়ের নিচে রাখার আকাঙ্ক্ষা। তোমার নেই?'

'না।'

'আছে, তোমারও আছে। সবারই আছে। থাকতেই হবে।'

রফিক কিছু বলল না। তারা হাঁটছে পাশাপাশি। মেজর সাহেব কথা বলছেন বন্ধুর মতো। তাঁর কথার ধরন দেখে মনে হয় রফিককে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।

বদিউজ্জামানের বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় মীর আলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'কেডা যায়? কেডা যায়, জয়নাল মিয়া?'

মেজর সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। রফিক বলল, 'লোকটা স্যার অন্ধ।' মেজর সাহেবকে মনে হল এই খবরে বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন।

'কে লোকটি, কথা বলে না? কেডা গো?'

'আমি রফিক।'

'রফিকটা কেডা? কোন বাড়ির?'

'ঘরের ভেতর গিয়ে বসেন চাচা।'

মেজর সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তুমি ওকে কী বললে?' রফিক ইংরেজিতে বলল, 'আমি তাঁকে ঘরে যেতে বললাম।'

'কেন?'

'এমনি বললাম।'

মীর আলি ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচাল, 'এরা কে? এরা কে?' মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি ওকে বল আমি মেজর এজাজ আহমেদ, কম্যান্ডিং অফিসার ফিফটি এইটথ্‌ ইনফেন্ট্রি ব্যাটালিয়ান।'

'স্যার, বাদ দেন। বুড়ো মানুষ।'

'তোমাকে বলতে বলেছি, তুমি বল। যাও, কাছে গিয়ে বল।'

রফিক এগিয়ে গেল। মেজর সাহেব তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তিনি কি বুড়োর চোখেমুখে কোনো পরিবর্তন দেখতে চাচ্ছিলেন? কোনো রকম পরিবর্তন অবশ্যি দেখা গেল না। রফিক ফিরে আসতেই মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি এই অন্ধ বুড়োকে বল, মেজর সাহেব আপনাকে সালাম জানাচ্ছেন।'

রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও।' রফিক এগিয়ে গেল। বুড়ো মীর আলি কিছুই বলল না। মাথা নিচু করে বসেই রইল।

আকাশে মেঘ জমছে। প্রচুর মেঘ। কালবৈশাখী হবে নিশ্চয়ই। তারা হাঁটছে নিঃশব্দে। রফিক একটি সিগারেট ধরিয়েছে। মেজর সাহেব তাকে মাঝে-মাঝে লক্ষ করছেন।

'রফিক!'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি তো জানতে চাইলে না আমি ওকে সালাম জানালাম কেন। জানতে চাও না?'

রফিক কিছু বলল না।

রেশোবা গ্রামে আমার যে বৃদ্ধ বাবা আছেন, তিনি অন্ধ। তিনিও বাড়ির উঠোনে এই বুড়োটির মতো বসে থাকেন। পায়ের শব্দ পেলেই এই বুড়োটির মতো বলেন, 'ইয়ে কৌন?'

'পৃথিবীর সব জায়গার মানুষই আসলে এক রকম।'

'কথাটি কি তুমি বিশেষ কোনো কারণে বললে?'

'না, কোনো বিশেষ কারণে বলি নি।'

'রফিক, আমরা একটা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। সারভাইভালের প্রশ্ন। এই সময়ে অন্যায় কিছু হবেই। উল্টোটা যদি হত—ধর বাঙালি সৈন্য আমার গ্রামে ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় আছে, তখন তারা কী করত? বল, কী করত তারা? যে, অন্যায় আমরা করছি তারা কি সেগুলি করত না?'

'না।'

'না? কী বলছ তুমি! যুক্তি দিয়ে কথা বল। রাগ, ঘৃণা, হিংসা আমাদের মধ্যে আছে, তোমাদের মধ্যেও আছে।'

রফিক হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত ইশারা করে বলল, 'এরা ডেডবডিটা এখনো সরায় নি।' মেজর সাহেব দেখলেন দরজার পাশে বুড়োমতো একটি লোক কাত হয়ে পড়ে আছে। নীল রঙের বড়-বড় মাছি ভনভন করে উড়ছে চারদিকে।

'স্যার, এই লোকটির নাম নীলু সেন।'

'এর কি কোনো আত্মীয়স্বজন নেই? এভাবে ফেলে রেখেছে কেন?'

রফিক গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'বলাই, বলাই।' কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

'কাকে ডাকছিলে?'

'বলাইকে। ওর ছেলে কিংবা এ-রকম কিছু। এরা দু' জন এই বাড়িতে থাকে।'

'এত বড় একটা বাড়িতে দু'টিমাত্র প্রাণী থাকে?'

'এখন থাকে একটি।'

'রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'আমার মনে হয় তুমি সূক্ষ্মভাবে আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করছ।'

'স্যার, আমি কিছুই বলবার চেষ্টা করছি না। এখন যা বলার তা আপনি বলবেন। আমি শুধু শুনব।'

'এর মানে কি?'

'কোনো মানে নেই, স্যার। আপনি এত মানে খুঁজছেন কেন?'

দু' জন আবার হাঁটতে শুরু করল। কালীমন্দিরের সামনে মেজর সাহেব থামলেন। কালীমূর্তি তিনি এর আগে দেখেন নি। একটিমাত্র দরজা খোলা, পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। মেজর সাহেব ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখতে চাইলেন। রফিক বলল, 'স্যার, ঝড় হবার সম্ভাবনা। আমাদের তাড়াতাড়ি ফেরা উচিত।'

'ফিরব, তোমাদের কালীমূর্তি দেখে যাই।'

'তোমাদের বলা ঠিক নয়, স্যার। আমি মুসলমান।'

'তোমরা মাত্র পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাকি পঁচাত্তর ভাগ হিন্দু। তুমি মন্দিরে ঢুকে মূর্তিকে প্রণাম করলেও আমি কিছুমাত্র অবাক হব না।'

রফিক কোনো জবাব দিল না। মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় ধরে আগ্রহ নিয়ে মূর্তি দেখলেন। হাসিমুখে বললেন, 'চারটি হাতে এই মহিলাটিকে মাকড়সার মতো লাগছে। লাগছে না?'

'আমার কাছে লাগছে না। আমরা ছোটবেলা থেকেই মূর্তিগুলি এ-রকম দেখে আসছি। আমার কাছে এটাকেই স্বাভাবিক মনে হয়।'

মেজর সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'রফিক।'

'জ্বি স্যার?'

'এই মূর্তিটির পেছনে এক জন কেউ লুকিয়ে আছে।'

রফিক চুপ করে রইল।

'তুমি সেটা আমার আগেই বুঝতে পেরেছ। পার নি?'

রফিক জবাব দিল না।

'বুঝতে পেরেও আমাকে কিছু বল নি।'

রফিক ক্লান্ত স্বরে ডাকল, 'বলাই বলাই।' মূর্তির পেছনে কিছু একটা নড়েচড়ে উঠল।

'তুমি কী করে বুঝলে ও বলাই?'

'আমি অনুমান করছি। মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে, তাই অনুমান করছি। বলাই নাও হতে পারে। হয়তো অন্য কেউ। হয়তো কানাই।'

'মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে সে কি ভাবছে মা কালী ওকে রক্ষা করবেন?'

'ভাবাই তো স্বাভাবিক। অনেক মুসলমান এ-রকম অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয়। ভাবে আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করবেন।'

মেজর সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। রফিক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'অনেক জায়গায় মসজিদ থেকে টেনে বের করে ওদের মারা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের রক্ষা করতে পারেন নি।

'তুমি কী বলতে চাচ্ছ?'

'আপনি যদি বলাইকে মারতে চান—কালীমূর্তি ওকে রক্ষা করতে পারবে না। এটাই বলতে চাচ্ছি, এর বেশি কিছু না।'

'ওকে বের হয়ে আসতে বল।'

রফিক ডাকল, 'বলাই, বলাই।' বলাই জবাব দিল না।

একটা মৃদু ফোঁপানির শব্দ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঝড় শুরু হল। প্রচণ্ড ঝড়। মেজর সাহেব মন্দিরের ভেতর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হুম-হুম শব্দ উঠছে। দেখতে-দেখতে আবহাওয়া রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। মন্দিরসংলগ্ন বাঁশঝাড়ে ভয়-ধরানো শব্দ হতে লাগল। রফিক এসে দাঁড়াল মেজর সাহেবের পাশে। মেজর সাহেব মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বিউটিফুল!' কালীমূর্তির পেছনে উবু হয়ে বসে থাকা বলাইয়ের কথা তাঁর মনে রইল না। ঝড়ের সঙ্গে-সঙ্গে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। মেজর সাহেব দ্বিতীয় বার বললেন, 'বিউটিফুল!'

সামনে খোলা মাঠ। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মাঠে ধূলি ও শুকনো পাতায় ঘূর্ণির মতো উঠেছে। এর মধ্যেই খালিগায়ে একজনকে ছুটে যেতে দেখা গেল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে মহা উল্লসিত। মেজর সাহেব বললেন, 'লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ?' রফিক নিস্পৃহ স্বরে বললো, 'ও নিজাম, পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটি পাগল থাকে।'

'এ-গ্রামের সবাইকে কি তুমি এর মধ্যেই চিনে ফেলেছ?'

'না, কয়েক জনকে চিনি। সবাইকে না।'

'ঐ পাগলটা কি জঙ্গলা-মাঠের দিকে যাচ্ছে না?'

'মনে হয় যাচ্ছে। পাগলরা বন-জঙ্গল খুব পছন্দ করে। মানুষের চেয়ে গাছকে তারা বড় বন্ধু মনে করে।'

'রফিক।'

'জি স্যার।'

'তোমার পড়াশোনা কদ্দূর?'

'পাস কোর্সে বি. এ. পাশ করেছি।'

'মাঝে-মাঝে তুমি ফিলসফারদের মতো কথা বল।'

'পরিবেশের জন্যে এ-রকম মনে হয়। বিশেষ বিশেষ পরিবেশে সাধারণ কথাও খুব অসাধারণ মনে হয়।

'তা ঠিক।'

মেজর সাহেব মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঝড়ের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। মন্দিরের একটা জানালা খুলে গিয়েছে। খটখট শব্দে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়। রফিক বলল, 'স্যার কি ভেতরে গিয়ে বসবেন?'

'না।'

পাগল নিজাম সত্যি-সত্যি কি বনের ভেতর ঢুকেছে? মেজর সাহেব তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। তাঁকে অত্যন্ত চিন্তিত মনে হচ্ছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'জর্জ বার্নার্ড শ' মিলিটারি অফিসার সম্পর্কে কী বলেছেন জান?'

'জানি না স্যার।'

'তিনি বলেছেন, দশ জন মিলিটারি অফিসারের মধ্যে ন' জনই হয় বোকা। বাকি এক জন রামবোকা।'

'জর্জ বার্নার্ড শ'র রচনা আমাদের সিলেবাসে ছিল না। আমি তাঁর কোনো লেখা পড়ি নি।'

'লোকটি রসিক। তবে তাঁর কথা ঠিক নয়। মাঝে-মাঝে মিলিটারি অফিসারদের মধ্যেও বুদ্ধিমান লোক থাকে। যেমন আমি। ঠিক না?'

'জ্বি স্যার।'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তুমি যাকে পাগল বলছ, সে পাগল নয়। সে জঙ্গলা-মাঠে যাচ্ছে খবর দিতে।'

'নিজাম আলি পাগল। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'কী কথা হয়েছে?'

'পাগলদের সঙ্গে যে-রকম কথা হয় সে-রকম। বিশেষ কিছু না।'

'বুঝলে কী করে, ও পাগল?'

'ও মিলিটারি আসায় অত্যন্ত খুশি হয়েছে। এর থেকেই বুঝেছি।'

'তুমি বলতে চাও মিলিটারি আসাটা কোনো আনন্দের ব্যাপার নয়?'

'জ্বি—না স্যার।'

মেজর সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করে দূরের বনের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'চল যাই।'

'কোথায়?'

'স্কুলে ফিরে যাই।'

'এই ঝড়ের মধ্যে?'

'হ্যাঁ।'

মেজর সাহেব মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে পড়লেন। ঝড়ে উড়িয়ে নিতে চাচ্ছে। কিন্তু তিনি হাঁটছেন স্বাভাবিকভাবেই। সাপের শিসের মতো শিস দিচ্ছে বাতাস। জুম্মাঘরের কাছাকাছি আসতেই মুসলধারে বৃষ্টি শুরু হল। মেজর এজাজ আহমেদ সেই বৃষ্টি গ্রাহ্যই করলেন না।

নিজের মনে গুনগুন করতে লাগলেন। কিংস্টোন ট্রয়োর একটি গান—যার সঙ্গে বর্তমান পরিবেশ সমস্যার কোনো সম্পর্কই নেই।

Pretty girls are everywhere
And when you call me I will be there.

মেজর সাহেবের গলা বেশ সুন্দর।

১২

ঝড় স্থায়ী হল আধা ঘন্টার মতো।

ঝড়ে গ্রামের কারোর তেমন কোনো ক্ষতি হল না। শুধু বদিউজ্জামানের নতুন টিনের বাড়িটির ছাদ উড়ে গেল। মীর আলি আতঙ্কে অস্থির হয়ে চেঁচাতে লাগল। অনুফা কী করবে ভেবে পেল না। তাদের বাড়ি গ্রামের বাইরে। ছুটে গ্রামে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। গোয়ালঘরটি এখনো টিকে আছে। সেখানে যাওয়া যায়। কিন্তু বাতাসের বেগ এখনো কমে নি। সেই নড়বড়ে চালা কখন মাথার উপর পড়ে তার ঠিক কি? সে পরীবানুকে কোলে নিয়ে তার শ্বশুরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রইল। মীর আলি ভাঙা গলায় চেঁচাতে লাগল, 'বদি, বদি রে, ও বদিউজ্জামান।'

বদিউজ্জামানের চোখ জবাফুলের মতো লাল। এখন আর তার আগের মতো কষ্টবোধ হচ্ছে না। পানিতে দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালোই লাগছে। ঝড়বৃষ্টির সময় সে নিজের মনে খানিকক্ষণ হেসেছে। কেন হেসেছে সে জানে না। কোনো কারণ ছাড়াই হাসি এসেছে। বদিউজ্জামানের ভয়ও কমে এসেছে। কিছুক্ষণ আগে একটি শেয়াল এসে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে বেশ শব্দ করেই বলেছে, 'যাহ্ যাহ্।' এই শেয়ালটি আবার এসেছে। মাথা ঘুরিয়ে–ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। অন্ধকার হয়ে আসছে। টকটকে লাল চোখ নিয়ে বদিউজ্জামান তাকিয়ে আছে শেয়ালটির দিকে। তার ভালোই লাগছে। গিরগিটিটি দুপুরের পর থেকেই নেই। বদিউজ্জামানের খুব নিঃসঙ্গ লাগছিল। এখন আর লাগছে না।

মাগরেবের নামাজ আদায় করতে চার-পাঁচ জন মুসল্লি গিয়েছিল মসজিদে। আজানের পরপরই কয়েকটি গুলির শব্দ হওয়ায় তারা নামাজ আদায় না-করেই ফিরে এল। ফেরার পথে তাদের মনে হল কাজটা ঠিক হল না। এতে আল্লাহ্‌র গজব পড়ার সম্ভাবনা। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। নামাজ পড়ল। মসজিদ থেকে বেরুবার সময় দেখল রাস্তায় মিলিটারি। তারা আবার মসজিদে ফিরে গেল। রাত কাটাল সেখানেই।

সন্ধ্যার পর গ্রামের কোথাও কোনো বাতি জ্বলল না। চারদিক অন্ধকারে সবাই বসে রইল। কোনো সাড়াশব্দ নেই, শুধু কৈবর্তপাড়ায় কেউ যেন সুর করে কাঁদছে। সেই সুরেলা কান্না ভেসে আসছে অনেক দূর পর্যন্ত। চিত্রা বুড়ি বসে আছে কৈবর্তপাড়ায়। তাকে কেউ কিছু বলছে না। চিত্রা বুড়িও কাঁদছে। হাউমাউ করে কান্না।

বলাই কোনোখানেই বেশিক্ষণ থাকতে পারছে না। সারাক্ষণই তার মনে হচ্ছে এই বুঝি তাকে ধরতে আসছে। সে অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই বেশ কয়েক বার জায়গা বদল করল। বেশি দূর কখনো গেল না। সেনবাড়ি, সেনবাড়ির মন্দির—এর মধ্যেই তার ঘোরাফেরা। সন্ধ্যা মেলাবার পর সে চিলেকোঠার লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেল। ছাদে আধ হাতের মতো পানি জমে আছে। সে বসে রইল পানির মধ্যে। বেশ কিছুক্ষণ তার ভালোই কাটল। তারপরই মনে হতে লাগল লোহার সিঁড়িতে যেন শব্দ হচ্ছে। মিলিটারিরা উঠে আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। তারপর আবার সব চুপচাপ। কেউ আসে নি—মনের ভুল। বলাইয়ের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে গেল। আবার মনে হল কেউ আসছে। সিঁড়ি কাঁপছে। বলাই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে থাকল।

ঝড়ের সময় এক জন মিলিটারি সুবাদার ও তিন জন রাজাকারের একটি দল ছুটতে-ছুটতে সফদরউল্লাহ্‌র চালাঘরে এসে উঠেছিল। সফদরউল্লাহ্ বাড়িতে ছিল না। মেয়েছেলেদের গ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না এ নিয়ে সে আলাপ করতে গিয়েছিল জয়নাল মিয়ার সঙ্গে।

ওরা সফদরউল্লাহ্‌র ঘরে ঢুকেই টর্চ টিপল। সেই টর্চের আলো পড়ল জড়সড় হয়ে বসে থাকা সফদরউল্লাহ্‌র স্ত্রী ও তার ছোট বোনের মুখে। ছোট বোনটির বয়স বার। মিলিটারি সুবাদার মুগ্ধ কণ্ঠে বলল—এ-রকম সুন্দর মেয়ে সে কাশ্মিরেই শুধু দেখেছে। বাঙালিদের মধ্যে এ-রকম সুন্দর দেখে নি। সে খুবই সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে বার বছরের মেয়েটির বুকে হাত রাখল। ঝড়ের জন্যে এই দু' বোনের চিৎকার কেউ শুনতে পেল না।

মেয়েদের গ্রামের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যাপারে জয়নাল মিয়ার অভিমত হল—এর কোনো দরকার নাই। হিন্দু মেয়েদের কিছুটা ভয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু মুসলমান মেয়েদের কোনো ভয় নাই। জয়নাল মিয়া দৃঢ় স্বরে বলল, 'মুসলমানের শইলে এরা হাত দেয় না। এই গ্রামে যে তিনটা মানুষ মারা গেছে, এর মধ্যে মুসলমান কেউ আছে? কও তোমরা, আছে?'

কথা খুবই সত্যি। জয়নাল মিয়া নিচু স্বরে বলল, 'মুসলমানের সঙ্গে ব্যবহারও খুব বালা। মীর আলি চাচারে মেজর সাব সালাম দিছে। বিশ্বাস না হইলে জিগাইয়া আও।'

এই কথাটিও সত্যি। তবু মতি বলল, 'ঘরের মেয়েছেলেরা বড় অস্থির হইয়া পড়ছে।' জয়নাল মিয়া দৃঢ়স্বরে বলল, 'রাইত-দুপুরে এইভাবে টানটানি করার কোনো দরকার নাই। যাও, তোমরা বাড়িত গিয়া আল্লাহ্-খোদার নাম নেও। ফি আমানিল্লাহ্। ভয়ের কিছু নাই।'

যে অল্প ক' জন এসেছিল তারা ঝড়ের মধ্যেই চলে গেল। ঝড় থামবার পর জয়নাল মিয়ার কাছে খবর এল—মেজর সাহেব তার সঙ্গে দেখা করতে চান। সে যেন দেরি না করে। জয়নাল মিয়া ভীত স্বরে বলল, 'যাও, গিয়া বল, আমি আসতাছি।' বাঙালি রাজাকারটি বিরক্ত মুখে বলল, 'আমার সাথে চলেন। সাথে যাইতে বলছে।'

সফদরউল্লাহ্র বাড়ির সামনে এসে জয়নাল মিয়ার মনে হয় ভেতরের বাড়িতে মেয়েছেলে কাঁদছে। সফদরউল্লাহ্ উঠোনে বসে আছে। জয়নাল মিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কী হইছে?' সফদরউল্লাহ জবাব দিল না।

'কান্দে কে?'

সফদরউল্লাহ্ সেই প্রশ্নেরও জবাব দিল না। সঙ্গের রাজাকারটি জয়নাল মিয়ার পিঠে ঠেলা দিয়ে বলল, 'তাড়াতাড়ি হাঁটেন।'

১৩

মেজর সাহেব এক মগ কফি হাতে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সমস্ত গা ভেজা। মাথায় টুপি নেই। ভেজা চুল বেয়ে ফোঁটা-ফোঁটা পানি পড়ছে। আজিজ মাস্টার উঠে দাঁড়াল। ইমাম সাহেব বসেই রইলেন। তাঁর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। কিছু সময় পরপরই তাঁর বমি হচ্ছে। ঘরময় বমির কটু গন্ধ। রফিক একটি হারিকেন টেবিলের উপর রেখে চেয়ার এগিয়ে দিল মেজর সাহেবের দিকে। তিনি বসলেন। একটি পা রাখলেন চেয়ারে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। প্রশ্নগুলি ইমাম সাহেবের প্রতি। রফিককে প্রতিটি প্রশ্ন ও উত্তর ইংরেজি করে দিতে হচ্ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের গতি হল শ্লথ, সে-জন্যে মেজর সাহেবের কোনো ধৈর্যচ্যুতি হল না।

'তারপর, ইমাম ভালো আছ?'

'জ্বি।'

'আমি তো খবর পেলাম ভালো নেই। ক্রমাগত বমি হচ্ছে।'

'জ্বি হুজুর।'

'শাস্তির দৃশ্যটা ভালো লাগে নি?'

ইমাম সাহেব জবাব দিলেন না। বমির বেগ সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মেজর সাহেবের মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা গেল।

'দৃশ্যটি কি খুব কঠিন ছিল?'

'জ্বি।'

'তুমি নিজে নিশ্চয়ই গরু-ছাগল জবাই কর। কর না?'

'জ্বি, করি।'

'তখন খারাপ লাগে না?'

ইমাম সাহেব একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেললেন। মেজর সাহেব কফির মগে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। জবাব পাওয়া গেল না।

'ইমাম।'

'জ্বি স্যার।'

'এখন আমাকে বল, তোমাদের ঐ জঙ্গলে মোট কত জন বাঙালি সৈন্য আছে?'

'আমি জানি না স্যার।'

'সঠিক সংখ্যাটি না বলতে পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। অনুমান করে বল।'

'আমি জানি না স্যার।'

'সৈন্য আছে কিনা সেটা বল।'

'স্যার, আমি জানি না।'

'আচ্ছা বেশ—সৈন্য নেই, এই কথাটিই তোমার মুখ থেকে শুনি।'

'স্যার, আমি জানি না। কিছুই জানি না স্যার।'

মেজর সাহেব কফির মগ নামিয়ে রাখলেন। সিগারেট ধরালেন। তাঁর কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল।

'তুমি কখনো ঐ বনে যাও নি?'

'জ্বি–না স্যার। আমি ধর্মকর্ম নিয়ে থাকি।'

'ধর্মকর্ম নিয়ে থাক?'

'জ্বি স্যার।'

'মসজিদে লোক হয়?'

'হয় স্যার।'

'সেখানে তুমি কি পাকিস্তানের জন্যে দোয়া কর?'

ইমাম সাহেব চুপ করে গেলেন। মেজর সাহেবের কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল।

'খুতবার শেষে পাকিস্তানের জন্যে কখনো দোয়া কর নি?'

'পৃথিবীর সব মুসলমানের জন্যে দোয়া খায়ের করা হয় স্যার।'

'তুমি আমার কথার জবাব দাও। পাকিস্তানের জন্যে দোয়া কর নি?'

'জ্বি–না স্যার।'

'বাংলাদেশের জন্যে কখনো দোয়া করেছ?'

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন। মেজর সাহেব হঠাৎ প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন। ইমাম সাহেব চেয়ার থেকে উল্টে পড়ে গেলেন। রফিক তাঁকে উঠে বসাল। মেজর সাহেব ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, 'ব্যথা লেগেছে?'

'জ্বি–না।'

'এতটুকু ব্যথা লাগে নি।'

'জ্বি–না স্যার।'

'আমার হাত এতটা কমজোরি তা জানা ছিল না।'

মেজর সাহেব হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে দ্বিতীয় চড়টি দিলেন। ইমাম সাহেব গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। তাঁর নাক দিকে রক্ত পড়তে শুরু করল। রফিক তাঁকে

তুলতে গেল। মেজর সাহেব বললেন, 'ও নিজে-নিজেই উঠবে। ইমাম, উঠে বস।' ইমাম সাহেব উঠে বসলেন।

'এখন বল, তুমি শেখ মুজিবর রহমানের নাম শুনেছ?'

'জ্বি, শুনেছি।'

'সে কে?'

ইমাম সাহেব চুপ করে রইলেন।

'সে কে তুমি জান না?'

মেজর সাহেব এগিয়ে এসে তৃতীয় চড়টি বসালেন। ইমাম সাহেব শব্দ করে দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন। মেজর সাহেব তাকালেন আজিজ মাস্টারের দিকে।

'তারপর কবি, তুমি কেমন আছ? ভালো আছ?'

'জ্বি।'

'তুমি শুনলাম বেশ শক্তই ছিলে? বমিটমি কিছু কর নি?'

আজিজ মাস্টার জবাব দিল না।

'বাংলাদেশের উপর কখনো কবিতা লিখেছ?'

'জ্বি-না স্যার।'

'কেন, লেখ নি কেন?'

আজিজ মাস্টার চুপ করে রইল।

'শেখ মুজিবের উপর লিখেছ?'

'জ্বি-না।'

আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, 'তুমি প্রেমের কবিতা ছাড়া অন্য কিছু লেখ না?'

'জ্বি-না।'

'তুমি দেখি দারুণ প্রেমিক-মানুষ। সব কবিতা কি মালা নামের ঐ বালিকাকে নিয়ে লেখা? জবাব দাও। বল হ্যাঁ কিংবা না।'

'হ্যাঁ।'

'শোন আজিজ, আমি কথা রাখি। আমি কথা দিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব, সেটা আমার মনে আছে। আমি ঐ মেয়ের বাবাকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বল, ঐ বনে কত জন সৈন্য লুকিয়ে আছে?'

'স্যার, বিশ্বাস করেন আমি কিছুই জানি না।'

'আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না। তুমি বোধহয় জান না আমি কী পরিমাণ নিষ্ঠুর হতে পারি। তুমি জান?

'জ্বি স্যার, জানি।'

'না, তুমি জান না। তবে এক্ষুণি দেখতে পাবে। রফিক, তুমি ওর জামা- কাপড় খুলে ওকে নেংটো করে ফেল।'

আজিজ মাস্টার হতভম্ব হয়ে তাকাল। এই লোকটা বলে কী। আজিজ মাস্টারের পা কাঁপতে লাগল। মেজর সাহেব বললেন, 'দেরি করবে না, আমার হাতে সময় বেশি নেই। রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'এই মিথ্যাবাদী কুকুরটাকে নেংটো করে সমস্ত গ্রামে ঘুরে-ঘুরে দেখাবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'আর শোন, একটা ইটের টুকরো ওর পুরুষাঙ্গে ঝুলিয়ে দেবে। এতে সমস্ত ব্যাপারটায় একটা হিউমার আসবে।'

আজিজ মাস্টার কাঁপা গলায় বলল, 'আমি কিছুই জানি না স্যার। একটা কোরান শরিফ দেন, কোরান শরিফ ছুঁয়ে বলব।'

'তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। রফিক, যা করতে বলছি কর।'

রফিক থেমে-থেমে বলল, 'মানুষকে এভাবে লজ্জা দেবার কোনো অর্থ হয় না।' মেজর সাহেবের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হতে থাকল। তিনি তাকিয়ে আছেন রফিকের দিকে। রফিক বলল, 'আপনি যদি একে অপরাধী মনে করেন তাহলে মেরে ফেলেন। লজ্জা দেবার দরকার কি?'

'তুমি একে অপরাধী মনে কর না?'

'না। আমার মনে হয় সে কিছু জানে না।'

'সে এই গ্রামে থাকে আর এত বড় একটা ব্যাপার জানবে না?'

'জানলে বলত। কিছু জানে না, তাই বলছে না।'

'বলবে সে ঠিকই। ইট বেঁধে তাকে বাড়ি-বাড়ি নিয়ে যাও—দেখবে তার মুখে কথা ফুটেছে। তখন সে প্রচুর কথা বলবে।'

রফিক ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'স্যার, ওকে এ-রকম লজ্জা দেয়াটা ঠিক না।'

'কেন ঠিক না?'

'আপনি শুধু ওকে লজ্জা দিচ্ছেন না, আপনি আমাকেও লজ্জা দিচ্ছেন। আমিও ওর মতো বাঙালি।'

'তাই নাকি! আমি তো জানতাম তুমি পাকিস্তানি? তুমি কি সত্যি পাকিস্তানি?'

'জ্বি স্যার।'

'আমার মনে হয় এটা তোমার সব সময় মনে থাকে না। মনে রাখবে।'

'জ্বি স্যার, রাখব।'

'এটা তোমার নিজের স্বার্থেই মনে রাখা উচিত।'

রফিক চুপ করে গেল। মেজর সাহেব বললেন, 'একটা মজার ব্যাপার কি জান রফিক? তুমি যদি আজিজ মাস্টারকে চয়েস দাও মৃত্যু অথবা লজ্জাজনক শাস্তি—তাহলে সে লজ্জাজনক শাস্তিটাই বেছে নেবে। মহানন্দে পুরুষাঙ্গে ইট বেঁধে মানুষের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বেড়াবে। জিজ্ঞেস করে দেখ।'

রফিক কিছুই জিজ্ঞেস করল না। মেজর সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, 'আজিজ, পরিষ্কার উত্তর দাও। মরতে চাও, না চাও না? আমি দ্বিতীয় বার এই প্রশ্ন করব না। ত্রিশ সেকেণ্ডের ভেতরে জবাব চাই। বল, মরতে চাও, না চাও না?'

'মরতে চাই না।'

মেজর সাহেব হাসিমুখে বললেন, 'বেশ, তাহলে কাপড় খুলে ফেল। তোমাকে ঠিক এক মিনিট সময় দেয়া হল তার জন্য।' আজিজ মাস্টার কাপড় খুলতে শুরু

করল।

'রফিক, আমার কথা বিশ্বাস হল?'

'হল।'

'বাঙালিদের মান-অপমান বলে কিছু নেই। একটা কুকুরেরও আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে, এদের তাও নেই। আমি যদি ওকে বলি—যাও, ঐ ইমামের পশ্চাৎদেশ চেটে আস, ও তাই করবে।'

রফিক মৃদু স্বরে বলল, 'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে অনেকেই এ-রকম করবে।'

'তুমি করবে?'

'জানি না, করতেও পারি। মৃত্যু একটা ভয়াবহ ব্যাপার। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে কে কী করবে তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বি স্যার। আপনার মতো একজন সাহসী মানুষও দেখা যাবে কাপুরুষের মতো কাণ্ডকারখানা করছে।'

মেজর সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এবং তারো মিনিটখানেক পর জয়নাল মিয়াকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। আজিজ মাষ্টার দু'হাতে তার লজ্জা ডাকতে চেষ্টা করল। ইমাম সাহেব বেশ স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'জয়নাল মিয়া ভালো আছেন?'

জয়নাল কিছু একটা বলতে চেষ্টা করল—বলতে পারল না। আজিজ মাষ্টারের মতো একজন বয়স্ক মানুষ সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে—এটি এখনো সে বিশ্বাস করতে পারছে না। ইমাম সাহেব বললেন, 'বড় খারাপ সময় জয়নাল সাব, আল্লাহ্-খোদার নাম নেন।'

জয়নাল মিয়া আবারো কিছু বলতে চেষ্টা করল, বলতে পারল না। কথা আটকে গেল।

রফিক শান্ত স্বরের বলল, 'জয়নাল সাহেব, আপনি বসেন। স্যার যা যা জিজ্ঞেস করবেন তার সত্যি জবাব দেবেন। বুঝতেই পারছেন।' জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। ইমাম সাহেব বললেন, 'চেয়ারে বসেন, মাটিতে প্রস্রাব আছে। নাপাক জায়গা।'

১৪

মেঘ নেই।

আকাশে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

রাত প্রায় আটটা, কিন্তু মনে হচ্ছে নিশুতি। হাওয়া থেমে গেছে। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না। সফদরউল্লাহ্ একটা দা হাতে মাঠে নেমে পড়ল। সে দু' জনকে খুঁজছে। এক জন তালগাছের মতো লম্বা। গোঁফ আছে। অন্য জন বাঙালি, তার মুখে বসন্তের দাগ। সফদরউল্লাহ কোনো রকম শব্দ না করে হাঁটছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। তাতে তার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। সে যেভাবে হাঁটছে তাতে মনে হয় অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছে। কোনো-কোনো সময়ে মানুষের ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

সে প্রথমে গেল বিলের দিকে। কেউ নেই সেখানে। বেশ কিছু কাটা ডাব পড়ে আছে চারদিকে। সফদরউল্লাহ্ দীর্ঘ সময় বিলের পারে দা হাতে বসে রইল। বাতাস নেই কোথাও, তবু বিলের পানিতে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ হচ্ছে। ওরা আবার হয়তো আসবে। পানিতে দাঁড় করিয়ে আরো মানুষ মারবে। সফদরউল্লাহ্র মনে হল কেউ-একজন যেন এদিকে আসছে। সে শক্ত করে দা'টি ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'কেডা?'

'আমি নিজাম। আপনে কী করেন?'

'কিছু করি না।'

'অন্ধকারে বইয়া আছেন ক্যান?'

সফদরউল্লাহ্ ফুঁপিয়ে উঠল। নিজাম বলল, 'সব মিলিটারি জমা হইতেছে জঙ্গলা-মাঠে। দেখবেন?' সফদরউল্লাহ্ সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

'হাতে দাও ক্যান?'

'আছে, কাম আছে। দাওয়ের কাম আছে।'

কৈবর্তপাড়া খালি হয়ে যাচ্ছে।

এরা সরে পড়ছে নিঃশব্দে। এদের অভ্যাস আছে—অতি দ্রুত সব কিছু গুছিয়ে সরে পড়তে পারে। অন্ধকারে এরা কাজ করে। ওদের শিশুরা চোখ বড়-বড় করে দেখে, হৈচৈ করে না, কিছুই করে না। মেয়েরা জিনিসপত্র নৌকায় তুলতে থাকে। কোনো জিনিসই বাদ পড়ে না। হাঁস, মুরগি, ছাগল—সবই ওঠানো হয়। এরা কাজ করে নিঃশব্দে। প্রবীণরা হুঁকো হাতে বেশ অনেকটা দূরে বসে থাকে। তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় কি হচ্ছে না হচ্ছে এরা কিছুই জানে না। এরা ঝিমুতে থাকে। ঝিমুতে-ঝিমুতেই চারদিকে লক্ষ রাখে। বুড়ো বয়সেও এদের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

মীর আলি খুনখুন করে কাঁদে।

ভাতের জন্যে কাঁদে। বদিউজ্জামান বাড়ি ফেরে নি। সে না-ফেরা পর্যন্ত অনুফা ভাত চড়াবে না। ঘরে চাল-ডাল সবই আছে। চারটা চাল ফোটাতে এমন কি ঝামেলা মীর আলি বুঝতে পারে না। অনেক রকম ঝামেলা আছে ঠিকই—মাথার উপর টিনের ছাদ নেই। গ্রামে মিলিটারি মানুষ মারছে। তাই বলে মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো চলে যায় নি? পরীবানুও বিরক্ত করছে না। ঘুমাচ্ছে। অসুবিধা তো কিছু নেই!

মীর আলি মৃদু স্বরে বলল, 'বৌ, চাইরডা ভাত রাইন্ধা ফেল।' অনুফা তীব্র স্বরে বলল, 'আপনে মানুষ না আর কিছু?'

মীর আলি অবাক হয়ে বলে, 'আমি কী করলাম!'

পনের-বিশ জন সেপাই বসে আছে স্কুলের বারান্দায়। এরাও ক্ষুধার্ত, সমস্ত দিন কোনো খাওয়া হয় নি। ওদের জন্যে রান্না হবার কথা মধুবনে। ঝড়ের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে। রান্না-করা খাবার এসে পৌঁছায় নি। কখন এসে পৌঁছাবে কে জানে? এরা সবাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে শ্রান্ত ভঙ্গিতে বসে আছে। কয়েক জন স্পষ্টতই ঘুমাচ্ছে। কিছু বাঙালি রাজাকার ওদের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছে। গল্প জমছে না। ওরা হাল ছাড়ছে না, 'ওস্তাদজী' 'ওস্তাদজী' বলেই যাচ্ছে।

বদিউজ্জামানের মনে হল জ্বর এসেছে। সে নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথায় হাত দিলে কোনো উত্তাপ পাওয়া যায় না। কিন্তু তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। কিছুক্ষণ আগেও তার শীত করছিল। এখন আর করছে না। খুকখুক করে কে যেন কাশল। নাকি সে নিজেই কাশছে? নিজামের মতো তারও কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? একবার মনে হল শীতল ও লম্বা একটা কি যেন তার শার্টের ভেতর ঢুকে গেছে। সে প্রায় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চিৎকার করল না। মনের ভুল। শার্টের ভেতর কিছুই নেই। বদিউজ্জামানের মনে হল সে যেন অনেকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। কথাবার্তা বলতে-বলতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। এটাও কি মনের ভুল? বদিউজ্জামান উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। সে ঠিক করে রাখল মিলিটারিরা তাকে মেরে ফেললে সে বলবে, 'ভাইয়েরা কেমন আছেন?' বড় মজার ব্যাপার হবে। বদিউজ্জামান নিজের মনে খুকখুক করে হাসতে লাগল। বাঁ দিকে চারটা সবুজ চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে—শেয়াল। দিনে যে-শেয়ালটা তাকে দেখে গিয়েছিল সে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ভাবতে বেশ মজা লাগল বদিউজ্জামানের। সে আবার হাসতে শুরু করল। এবার আর নিজের মনে হাসা নয়, শব্দ করে হাসা।

১৫

রফিক বাইরে এসে দেখল, মেজর সাহেব স্কুলঘরের শেষ প্রান্তের বারান্দায় একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। রফিককে দেখে তিনি কিছুই বললেন না। রফিক বারান্দায় নেমে গেল। অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ, তারপর হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। মেজর সাহেব ভারি গলায় ডাকলেন, 'রফিক।'

রফিক ফিরে এল।

'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'তেমন কোথাও না?'

'তোমাকে একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি।'

'বলুন।'

'তুমি কি জান আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না?'

'জানি।'

'কখন থেকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি জান?'

'শুরু থেকেই। কোনো বাঙালিকেই আপনি বিশ্বাস করেন না।'

'তা ঠিক। যারা বিশ্বাস করেছে, সবাই মারা পড়েছে। আমার বন্ধু মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল। ওরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

'মেজর বখতিয়ার বিশ্বাস করেছিল কি করে নি—সেটা আপনি জানেন না। অনুমান করছেন।'

'হ্যাঁ, তাও ঠিক। আমি জানি না।'

মেজর সাহেব হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ঐ মাস্টারটির বিশেষ অঙ্গে ইট ঝুলিয়ে দিয়েছ?'

'না।'

'কেন? প্রমাণ সাইজের ইট পাও নি?'

রফিক কথা বলল না। মেজর সাহেব চাপা স্বরে বললেন, 'বাঙালি ভাইদের প্রতি দরদ উথলে উঠেছে?'

'আমার মধ্যে দরদটরদ কিছু নেই মেজর সাহেব। ইট ঝোলানোটা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।'

'মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। আমি ইট-বাঁধা অবস্থায় ওকে ওর প্রেমিকার কাছে নিয়ে যাব। এবং ওকে বলব সেই প্রেমের কবিতাটি আবৃত্তি করতে।'

'কেন?'

'রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'তুমি আমাকে প্রশ্ন করার দুঃসাহস কোথায় পেলে?'

'আপনি একজন সাহসী মানুষ। সাহসী মানুষের সঙ্গে থেকে-থেকে আমিও সাহসী হয়ে উঠেছি।'

'আই সি।'

'এবং স্যার, আপনি এক বার আমাকে বলেছিলেন—আমার মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা বলে ফেলতে।'

'বলেছিলাম?'

'জ্বি স্যার।'

'সেই প্রিভিলেজ এখন আর তোমাকে দিতে চাই না। এখন থেকে তুমি কোনো প্রশ্ন করবে না।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'রফিক।'

'জ্বি স্যার।'

'আজ তোমাকে অস্বাভাবিক রকম উৎফুল্ল লাগছে।'

'আপনি ভুল করছেন স্যার। আমাকে উৎফুল্ল দেখানোর কোনো কারণ নেই। এমন কিছু ঘটে নি যে আমি উৎফুল্ল হব।'

'তুমি বলতে চাও যে বিমর্ষ হবার মতো অনেক কিছু ঘটেছে?'

'আমি তাও বলতে চাই না।'

মেজর সাহেব পশতু ভাষায় কি যেন বললেন। কোনো কবিতাটবিতা হবে হয়তো। রফিক তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'রফিক, তুমি পশতু জান?'

'জ্বি-না স্যার।'

'না চাইলেও শোন। এর মানে হচ্ছে—বেশি রকম বুদ্ধিমানদের মাঝে-মাঝে বড় রকম বোকামি করতে হয়।'

রফিক কিছুই বলল না। মেজর সাহেব বললেন, 'চল, জয়নাল লোকটির কাছ থেকে কিছু জানতে চেষ্টা করি। তোমার কি মনে হয় ও আমাদের কিছু বলবে?'

'না স্যার, বলবে না।'
'কি করে বুঝলে?'
'এরা কিছুই জানে না। কাজেই কিছু বলার প্রশ্ন ওঠে না।'
'চল দেখা যাক।'

'তোমার নাম জয়নাল?'
'জ্বি।'
'এই নেংটা মানুষটাকে তুমি চেন?'
'জ্বি স্যার।'
'ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়।'
জয়নাল মিয়া হতভম্ব হয়ে তাকাল।
'কিন্তু ওর যন্ত্রপাতি বেশি ভালো বলে মনে হচ্ছে না। আমার মনে হয় ভয় পেয়ে ওটার এই অবস্থা। আমি নিশ্চিত, উত্তেজিত অবস্থায় এটা আরো ইঞ্চিখানেক বড় হবে। কি বল জয়নাল?'
জয়নালের পা কাঁপতে লাগল—এসব কী শুনছে?
'তবে আমি ঐ যন্ত্রটার জন্যে একটা একসারসাইজের ব্যবস্থা করেছি। আমি ঠিক করেছি ওখানে একটা ইট ঝুলিয়ে দেব। এতে এটা আরো কিছু লম্বা হবে বলে মনে হয়।'
ইমাম সাহেব অস্ফুট একটি ধ্বনি করলেন। মেজর সাহেব বললেন, 'কিছু বলবে ইমাম?'
'জ্বি–না স্যার।'
'জয়নাল, তুমি কিছু বলবে?'
'জ্বি–না।'
'আমি ঠিক করেছি মাস্টারকে এই অবস্থায় তোমার মেয়ের কাছে নিয়ে যাব। জিজ্ঞেস করব এই সাইজে ওর চলবে কি না। জয়নাল, তোমার মেয়েটি কি বাড়িতে আছে?'
জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে পড়ল। মেজর সাহেব হাসি–হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। যেন কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ঘরে একটি শব্দও হল না।
'জয়নাল।'
'জ্বি?'
'তোমার মেয়েটি বাড়িতেই আছে আশা করি।'
জয়নাল মিয়া হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। মেজর সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, 'কান্না বন্ধ কর। কান্না আমার সহ্য হয় না। চল যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। চল চল।'
আজিজ মাস্টার তখন কথা বলল। অত্যন্ত স্পষ্ট স্বরে বলল, 'মেজর সাহেব, আমি মরবার জন্যে প্রস্তুত আছি। আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচান।'
মেজর সাহেব মনে হল বেশ অবাক হলেন। কৌতূহলী গলায় বললেন, 'মরতে রাজি আছ?'
'হ্যাঁ।'

'ভয় লাগছে না?'

'লাগছে।'

'তবু মরতে চাও?'

আজিজ মাস্টার জবাব না-দিয়ে নিচু হয়ে তার পায়জামা তুলে পরতে শুরু করল। মেজর সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন। কিছুই বললেন না।

আজিজ মাস্টারকে তার প্রায় দশ মিনিটের মধ্যে রাজাকাররা নিয়ে গেল বিলের দিকে। আজিজ মাস্টার বেশ সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল। যাবার আগে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্লামালিকুম।' ইমাম সাহেব বা জয়নাল মিয়া কেউ কিছু বলল না।

আজিজ মাস্টার চলে যাবার পর দীর্ঘ সময় কেউ কোনো কথা বলল না। মেজর সাহেব গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। জয়নাল মিয়া কাঁপতে লাগল থরথর করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্কুলঘরের পেছনে কয়েকটি গুলির শব্দ হল। ইমাম সাহেব ক্রমাগত দোয়া ইউনুস পড়তে লাগলেন।

মেজর সাহেব বললেন, 'জয়নাল, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক-ঠিক জবাব দাও। আমাকে রাগিও না। বল, মোট কত জন সৈন্য লুকিয়ে আছে তোমাদের জঙ্গলা-মাঠে? মনে রাখবে আমি একই প্রশ্ন দু' বার করব না। বল কত জন?'

'প্রায় এক শ'।'

ইমাম সাহেব চোখ বড়-বড় করে তাকালেন। রফিক অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর সাহেব সিগারেট ধরালেন। সিগারেট ধরাতে গিয়ে তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

'এরা কবে এসেছে এই বনে?'

'পরশু।'

'এই গ্রাম থেকে তোমরা ক' বার খাবার পাঠিয়েছ?'

'তিন বার।'

'আজিজ মাস্টার এবং ইমাম—এরা এ-খবর জানে?'

'জ্বি-না, এরা বিদেশি মানুষ। এদের কেউ বলে নাই।'

'ঐ সৈন্যরা এখান থেকে কোথায় যাবে জান?'

'জ্বি-না।'

'কেউ জানে?'

'জ্বি-না।'

'ওদের মধ্যে কত জন অফিসার আছে?'

'আমি জানি না।'

'ওদের সঙ্গে গোলাবারুদ কী পরিমাণ আছে?'

'জানি না স্যার।'

'ওদের মধ্যে আহত কেউ আছে?'

'আছে।'

'কত জন?'

'ছয়-সাত জন।'

'ওরাও বনেই আছে?'

'জ্বি—না।'

'ওরা কোথায়?'

'কৈবর্তপাড়ায়। জেলেপাড়ায়।'

'বনে খাবার নিয়ে কারা যেত?'

'কৈবর্তরা।'

মেজর সাহেব থামলেন। জয়নাল মিয়া মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগল। রফিক এখনো জানালার দিয়ে তাকিয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'জ্বি স্যার?'

'তুমি যাও। তোমাকে যেতে বললাম।'

জয়নাল মিয়া নড়ল না। উবু হয়ে বসে রইল। মেজর সাহেব বললেন, 'নাকি যেতে চাও না?'

'যেতে চাই।'

'তাহলে যাও। দৌড়াও। আমি মত বদলে ফেলবার আগেই দৌড়াও।'

জয়নাল মিয়া উঠে দাঁড়াল। নিচু হয়ে বলল, 'স্যার, স্লামালিকুম।'

মেজর সাহেব বললেন, 'ইমাম, তুমিও যাও।'

ইমাম সাহেব নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'যাও, যাও। চলে যাও। কুইক।'

ওরা ঘর থেকে বেরুল। স্কুলগেট পার হয়েই ছুটতে শুরু করল। মেজর সাহেব জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

'রফিক!'

'জ্বি স্যার?'

'জয়নাল কি সত্যি কথা বলল?'

'মনে হয় না স্যার। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে অনেক সময় এ-জাতীয় কথা বলা হয়।'

'কিন্তু আমি জানি, ও সত্যি কথাই বলেছে।'

রফিক চুপ করে রইল।

'এবং আমার মনে হচ্ছে তুমিও তা জান।'

রফিক তাকাল জানালার দিকে। বাইরে ঘন অন্ধকার।

'আমার মনে হয় তুমি আরো অনেক কিছুই জান।'

'আমি তেমন কিছু জানি না।'

'তুমি শুধু বল, তোমাদের সৈন্যরা এখনো কি বনে লুকিয়ে আছে?'

'আমি কী করে জানব?'

'তুমি অনেক কিছুই জান। আমি কৈবর্তপাড়ায় তল্লাশি করতে চেয়েছিলাম, তুমি বলেছিলে—প্রযোজন নেই।'

'আমার ভুল হয়েছিল। সবাই ভুল করে।'

'ঝড়ের সময় একটা পাগল ছুটে গেল বনের ভেতর। যায় নি?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে বনের ভেতর যেতে দেখে তুমি উল্লসিত হয়ে উঠলে।'

রফিক একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

'বল, তুমি উল্লসিত হও নি?'

'ভুল দেখেছেন স্যার।'

'আমার ধারণা, ঐ পাগলটি বনে খবর নিয়ে গেছে। এবং সবাই পালিয়েছে ঝড়ের সময়।'

মেজর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'বুঝতে পারছ না কোথায়? তুমি তো বুদ্ধিমান, তোমার তো বুঝতে পারা উচিত। বল, বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'ভয় লাগছে?'

'না।'

'ওরা কি ঝড়ের সময় পালিয়েছে?'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে ওরা অনেক দূর চলে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি মধুবনের দিকে গেলে হয়তো এখনো ওদের ধরা যাবে।'

'তুমি আবার আমাকে কনফিউজ করতে চেষ্টা করছ। এরা হয়তো বনেই বসে আছে।'

রফিক মৃদু হাসল।

'বল, ওরা কি বনে বসে আছে?'

'হয়তো আছে। গভীর রাতে বের হয়ে আসবে।'

'ঠিক করে বল।'

'আপনি এখন আমার কোনো কথাই বিশ্বাস করবেন না। কাজেই কেন শুধু-শুধু প্রশ্ন করছেন?'

কৈবর্তপাড়ায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। চিত্রা বুড়ি অবাক হয়ে আগুন দেখছে। রাজাকাররা ছোটাছুটি করছে। তাদের ছোটাছুটি দেখে মনে হয় খুব উৎসাহ বোধ করছে। আগুন জ্বালানোর জন্যে তাদের যথেষ্ট খাটাখাটনি করতে হচ্ছে। ভেজা ঘরবাড়ি। আগুন সহজে ধরতে চায় না।

মীর আলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে 'আগুন আগুন' বলে চিৎকার করছে। সে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু আগুন দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের মানুষজন সব বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে।

১৬

মেজর এজাজ আহমেদ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে ডান দিকে, চাইনীজ রাইফেল হাতে দু' জন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছে বিলে।

বিলের পানি অসম্ভব ঠাণ্ডা। রফিক পানি কেটে এগোচ্ছে। কী যেন ঠেকল হাতে।

...দার ছোট ভাই বিরু। উপুড় হয়ে ভাসছে। যেন ভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে বিরুর গায়ে হাত রেখে বলল, 'ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই।'

পাড়ে বসে–থাকা মেজর সাহেব বললেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক।'

'নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।'

'কী বলছ নিজেকে?'

'সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু।'

'রফিক।'

'বলুন।'

'ওরা কি বন ছেড়ে চলে গেছে? সত্যি করে বল।'

রফিক বেশ শব্দ করেই হেসে উঠল। আচমকা হাসির শব্দে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন।

কৈবর্তপাড়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে। আলো হয়ে উঠছে চারদিক। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাটো অসহায় একটা মানুষ বুকপানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন, 'রফিক, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও?'

রফিক শান্ত স্বরে বলল, 'চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না?'

মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ–দেশ থেকে।'

মেজর এজাজ আহমেদ সিগারেট ধরালেন, কৈবর্তপাড়ার আগুনের দিকে তাকালেন। পশতু ভাষায় সঙ্গের জোয়ান দু'টিকে কী যেন বললেন। গুলির নির্দেশ হয়তো। রফিক বুঝতে পারল না। সে পশতু জানে না।

হ্যাঁ, গুলির নির্দেশই হবে। সৈন্য দু'টি বন্দুক তুলছে। রফিক অপেক্ষা করতে লাগল।

বুক পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে লালচে আগুনের আঁচে যে–রফিক দাঁড়িয়ে আছে, মেজর এজাজ আহমেদ তাকে চিনতে পারলেন না। এ অন্য রফিক। মেজর এজাজের কপালে বিন্দু–বিন্দু ঘাম জমতে লাগল।